Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আঞ্জুম নাহার আঁখি

রোলঃ 23100120921

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আঞ্জুম নাহার আঁখি

রোলঃ 23100120921

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আঞ্জুম নাহার আঁখি, আইডিঃ 23100120921 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আঞ্জুম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আঞ্জুম নাহার আঁখি

আইডিঃ 23100120921

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গীবত কি? 6

প্রথম পরিচ্ছেদ 9

মৃত ব্যক্তির দোষ আলোচনাঃ 9

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 11

গীবতের প্রকারভেদ : 11

পোষাক সম্পর্কে গীবত: 16

বংশ সম্পর্কে গীবতঃ 17

বদ অভ্যাস সম্পর্কে গীবত: 19

পাপাচার সম্পর্কে গীবত: 21

পরোক্ষ গীবত: 23

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 25

জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ 25

সংশোধনের উদ্দেশ্যে— 26

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে : 29

লজ্জাহীন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করাঃ 31

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে : 32

গীবতের স্বরূপ : 35

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 44

গীবতের ফল 44

নেক আমল কবুল না হওয়া : 48

হিসাব কঠিন হওয়াঃ 49

হাশরের মাঠে গোশত খাওয়া : 50

কবরের আযাব..51
আস্থাহীনতা :...51
গীবত শয়তানকে আনন্দ দেয়ঃ...52
রোজার ছওয়াব নষ্ট হওয়া :...54
বিদ্বেষ ও বিভেদঃ...56
পঞ্চম পরিচ্ছেদ..57
গীবতের কারণ ও প্রতিকার...57
ক্রোধ :...57
গর্ব ও অহংকার :..63
পার্থিব সম্মানের মোহ :...68
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ..69
গীবতের কাফ্ফারা...69
গীবতকারীকে ক্ষমা করার ফজিলত :...72
গীবত শ্রবণের পাপ :..73
উপসংহার:...75

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যেখানে মানুষের নৈতিকতা, চরিত্র এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নৈতিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জিহ্বার সংযম। মানুষের জিহ্বা যেমন কল্যাণের মাধ্যম হতে পারে, তেমনি এটি ধ্বংসের কারণও হতে পারে। গীবত (পরনিন্দা) এমন একটি গুরুতর গুনাহ যা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির আখিরাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

গীবত কি?

গীবত আরবী শব্দ। শরীয়তের পরিভাষায় গীবতের অর্থ হলো- মুখে, কলমে, ইশারা-ইঙ্গীতের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা যা শুনলে সে মনে আঘাত পেতে পারে। আলোচিত ব্যক্তি মুসলমান হোক কিংবা কাফের।

যদি এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা হয় যা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গীবত নয়- তোহমত বা অপবাদ, এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা গীবতের চেয়েও জঘন্য। কেননা গীবতের সাথে সাথে এখানে মিথ্যা ভাষণও যোগ হচ্ছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি হাদীস এখানে পেশ করা যেতে পারে।

কোন প্রয়োজনে একবার এক মহিলা ছাহাবী রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রয়োজন শেষে উক্ত মহিলা বিদায় নিলেন। মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন সরল চিত্তে বললেন:

ইয়া রাসুলাল্লাহ! মহিলাটি কি বেটে আকৃতির নয়?

হযরত আয়েশার এ কথায় রসুলে করীম ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ব্যথিত হলেন। বললেন:

আয়েশা ! তুমি গীবত কেন করলে?

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবাক হয়ে বললেন:

ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমি তো অসত্য কিছু বলিনি।

আল্লাহর রসুল এরশাদ করলেনঃ

আয়েশা। এটা ঠিক যে তুমি মিথ্যা বলোনি। কিন্তু তুমি উক্ত মহিলার অগোচরে তার শারীরিক খুঁত আলোচনা করেছো। এটাই গীবত।

-ফকীহ আবুল্লায়ছ এ হাদীসটি বাবুল গীবতে উল্লেখ করেছেন।'

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উপস্থিত ছাহাবাদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি গীবতের অর্থ জানো?

ছাহাবাগণ আরয করলেন:

আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভাল জানেন!

এরশাদ হলো:

নিজের ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করার নাম গীবত যা শুনলে সে মনে আঘাত পেতে পারে।

ছাহাবাগণ আরয করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ। সে ভাইয়ের মধ্যে আলোচিত দোষটি সত্যি যদি থেকে থাকে?

এরশাদ হলো:

যদি তুমি এমন কোন দোষের কথা বল, যা তার মধ্যে নেই তবে সেটা তো গীবত নয়- তোহমত বা অপবাদ।

মাআলিমুত্তানযীল।

উক্ত হাদীস শরীফে "ভাই" শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য এই যে, মানুষ সাধারণত আপন ভাইয়ের দোষ কারো কাছেই প্রকাশ করে না। বরং যথা সম্ভব তা চেপে খেতেই চেষ্টা করে। তদ্রুপ অন্য কোন মানুষেরও গীবত ও দোষ চর্চা করা উচিৎ

নয়। কেননা ইসলামের সূত্রে সকলেই আমরা ভাই ভাই। দুনিয়ার প্রতিটি আদম সন্তান একে অন্যের ভাই।

একবার রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

অগোচরে মানুষের কোন দোষ আলোচনা করার নামই গীবত।

একথা শুনে ছাহাবাগণ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের তো ধারণা ছিলো যে, অমুলক কোন দোষের কথা আলোচনা করার নাম গীবত।

এরশাদ হলোঃ

না। বরং এটা গীবতের চেয়েও জঘন্য। এটা হলো তোহমত বা অপবাদ।

-দূররে মানছুর।

গীবত সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারনা আছে। তারা মনে করে যে, গীবতের অর্থ হলো, মানুষের গোপনীয় কোন দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। অতএব যে দোষের কথা আগে থেকেই সকলে জানে তা গীবত বলে বিবেচিত হবে না।

আপনি যদি কাউকে বলেনঃ ভাই। তুমি অমুকের গীবত কেন করছো?

তখন সাথে সাথেই সে উত্তর দিবেঃ

আমি তো নতুন কিছুই বলিনি। এ-তো সকলেই জানে। এমন তো নয় যে আমি বলার কারণেই শুধু মানুষ জানতে পেরেছে। অতএব এটা গীবত হবে কেন?

এটা অবশ্যই ভুল ধারণা। মনে রাখতে হবে যে, গোপনীয় কিংবা প্রকাশ্য যে কোন দোষের কথা আলোচনাই গীবত রূপে গণ্য হবে। অবশ্য কারো কোন গোপনীয় দোষের কথা প্রকাশ করে দেওয়া আরো জঘন্য অপরাধ। কেননা গীবতের সাথে এখানে আল্লাহ পাকের লুকিয়ে রাখা দোষ প্রকাশ করে দেওয়ার অপরাধও যোগ হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত ব্যক্তির দোষ আলোচনাঃ

জীবিত ব্যক্তিদের গীবত যেমন হারাম তেমনি কোন মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা, তার গীবত ও দোষ চর্চা করাও হারাম।

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে এ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি এরশাদ করেছেনঃ

যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে তখন তাকে তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দিও। কোন অবস্থাতেই নিজেকে তার গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত করোনা।

-আবু দাউদ, বাবুল গীবত

অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

মৃতদেরকে গালমন্দ করোনা। কেননা এখন তারা তাদের কর্মফল ভোগ করছে।

-তারগীব ওয়াত্তারহীব।

আরো এরশাদ হয়েছে:

মৃতদের গুণ আলোচনা করো না এবং দোষ চর্চা পরিহার করে চলো ।

-আবু দাউদ।

মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও একথা বলে যে, মৃত ব্যক্তির গীবত ও দোষ চর্চা এক গর্হিত অপরাধ। কেননা ওরা এখন এত নিঃসঙ্গ, এত অসহায় যে, কারো গীবত করার কিংবা গীবতের পাল্টা উত্তর দেওয়ার কোন ক্ষমতাই নেই ওদের। অতএব আমাদের উচিৎ ওদের গীবত ও দোষ চর্চা সযত্নে পরিহার করে চলা।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, অবসর পেলেই তিনি কোন কবরের পাশে গিয়ে বসে থাকতেন। তিনি বলতেন:

এরা আমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং কখনও আমার গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয় না।

-এহয়াউল উলুম।

দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা সর্বদা আমরা উপকৃতই হচ্ছি। কেননা কবর আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে। সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত করে। এই উপকারের স্বাভাবিক দাবী হচ্ছে এই যে, আমরাও তাদের গীবত ও দোষ চর্চা থেকে নিজেদেরকে সংযত রাখবো।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ

সব সময় আপনি কবরস্থানে গিয়ে বসে থাকেন। এর কারণ কি ?

উত্তরে তিনি বললেন: কবরের অধিবাসীদেরকে আমি ভালবাসি। কেননা ওরা আমাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং আমার দোষ আলোচনা করে না।

এহয়াউল উলুম।

তৃতীয়তঃ গীবত স্বভাবতঃই মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মনে কষ্টের কারণ হয়।

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি প্রায়ই "তাব্যাত" ছুরাটি পড়তো। এই সূরায় আবু লাহাবের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ ও লানত বর্ষিত হয়েছে। আবু লাহাব কাফির হলেও রসুলুল্লাহর চাচা হতেন। তাই বার বার এই ছুরাটি পড়ার কারণে আল্লাহর রসুল মনে খুব দুঃখ পেতেন। একবার তিনি সেই ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন:

ভাই! সারা কোরআন শরীফের এই একটি ছুরাই কি তুমি মুখস্ত করেছো?

চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মারা গেছে সে যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে তবে তো শাস্তির জন্য এটাই যথেষ্ট। দুনিয়াতে বসে তার দোষ চর্চা করা একেবারেই নিরর্থক। এতে শুধু জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় এবং আখেরাতে পাপের বোঝাই বৃদ্ধি করা হবে।

আর যদি সে ব্যক্তি জান্নাতী হয়ে থাকে তবে জান্নাতবাসীদের দোষ আলোচনা করা নিজের পরকালের জন্য আরও ক্ষতিকর।

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

মৃতদেহ সম্পর্কে তোমরা কেবল ভালো আলোচনাই করো। কেননা তারা জান্নাতবাসী হলে গীবতের দ্বারা তোমরা শুধু নিজেদের পরকালই ধ্বংস করে চলেছো।

আর যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে তবে সে কঠিন আযাব তারা এখন ভোগ করছে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

এহয়াউল উলুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গীবতের প্রকারভেদ :

শারীরিক গীবত: আড়ালে, অগোচরে মানুষের বিভিন্ন শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে রসিয়ে আলাপ করা এবং চোখ টিপে হাসাহাসি করাটা আজ যেন আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়। যখনই কোথাও এ ধরণের নোংরা আলোচনা শুরু হয়, তখন নিজেদের সকল কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে মজলিস গুলজার করে আমরা বসে থাকি। কে কাকে টেক্কা দিয়ে কত সরস আলোচনা করতে পারে-সে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি। একবারও তখন একথা মনে হয়না যে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব একদিন আমাদেরকে দিতে হবে। দুই কাঁধে সদা জাগ্রত ফিরেস্তা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজের নিখুঁত হিসাব রাখছেন।

অনেকেই আমরা এ ধরনের আলোচনা করে থাকি। অমুকের গায়ের রংটা কুচকুচে কালো; ঠিক যেন কাকের মাস্ত ভাই, গলার স্বরটা পেচার মত কর্কশ, দাঁতগুলি যেন বট গাছের শিকড়, নাকটা বেজায় লম্বা, হাঁটলে ভুঁড়িখানা আগে আগে চলে, হাড় কখানা হাতে গোনা যায়, চোখ দুটি যেন গর্তে ঢুকেছে, মাথার চুল দাঁড়িয়ে থাকে খেজুর কাটার মত, হাসলে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে, দেখলে মনে হবে তাল পাতার সেপাই।

এ ধরণের আলোচনা ও মন্তব্য খুবই গর্হিত। এবং গীবতের ঘৃণ্য প্রকার। কেননা প্রকৃত পক্ষে এটা আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে খুঁত ধরারই শামিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পাশে বসা ছিলেন।

প্রসংগক্রমে এক সময় উম্মুল মুমেনীন হযরত ছাফিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলে ফেললেন:

ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ বেটে আকৃতির মেয়েটাকে আপনি এত ভালোবাসেন। বলুন তো এমন কি আপনি ওর মধ্যে পেয়েছেন?

এ কথা শোনা মাত্রই রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাস্যজ্জ্বল পবিত্র মুখ মণ্ডল অত্যন্ত মলিন হয়ে গেলো। এক খণ্ড কালো মেগ যেনো চাঁদ ঢেকে ফেললো। বেদনাহত কণ্ঠে তিনি বললেন:

আয়েশা! আজ তুমি এমন কথা বলেছো যা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে সমুদ্রের স্বচ্ছ পানিও কালো হয়ে যাবে।

—আবু দাউদ, বাবুল গীবত।

অত্যন্ত লাজ-নম্র স্বভাবের অধিকারিণী হযরত উম্মে ছালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কিছুটা বেটে আকৃতির ছিলেন। এই নিয়ে তাঁর অগোচরে অন্যান্যদের মাঝে আপত্তিকর আলোচনা হতো।

তাদের সে আচরণের নিন্দা করেই আল কোরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়।

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরকে নিয়ে হাসাহাসি করো না। এবং মহিলাগণও যেন এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকে। কেননা হতে পারে, যাকে নিয়ে কৌতুক করা হচ্ছে তার শেষ পরিণাম অন্যদের তুলনায় ভালো হবে।

—তফসীরে জালালাইনের টিকায় বিবৃত শানে নুযুল।

হযরত মুআবিয়া বিন ক্বারয়াহ বলেছেন:

যদি কোন পঙ্গু লোক তোমার পাশ দিয়ে হেটে যায় আর তুমি বল-দেখ। পঙ্গু লোকটি হেটে যাচ্ছে। তবে মনে রেখো! এটা গীবত হলো। এবং এ জন্য তোমাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। দুররে মনছুর।

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম একদিন এক দাওয়াতের মজলিসে নিমন্ত্রিত হলেন এবং যথা সময়ে নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দস্তরখানা বিছানো হলো। তখন দেখা গেলো, নিমন্ত্রিতদের একজন তখনও এসে পৌঁছাননি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই অনুপস্থিত ব্যক্তিটি মজলিসী আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়লেন। লাগামহীন আলোচনায় মশগুল হয়ে গেল সকলে।

একজন ফোড়ন কেটে বললেন:

আমাদের কিছুটা অপেক্ষা করা উচিত। কেননা অত বিরাট ভুড়ি নিয়ে হেটে আসতে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

কথা শেষ না হতেই মজলিশ কাঁপিয়ে হাসির ঝড় উঠলো।

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম কাল বিলম্ব না করে দস্তরখানা থেকে উঠে চলে এলেন। এবং বাড়ি এসে এই বলে নিজের নফসকে তিরস্কার করলেন:

তোমার মধ্যে খাবার লোভ যদি না থাকতো তবে সে দস্তরখানে কিছুতেই তুমি শরীক হতে না। এবং তোমাকে গীবতও শুনতে হতো না। হে ইব্রাহীম ! কাল হাশরের মাঠে আল্লাহ পাকের সামনে তুমি কি জবাব দিবে?

ঘটনার পর নিজের নফসকে শাসন করার জন্য হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম তিনদিন পর্যন্ত কোন খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করেননি।

তামবীহুল গাফিলীন।

সংগত কারণেই হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম দস্তরখান থেকে উঠে গিয়েছিলেন। কেননা যে মজলিসে মানুষের গীবত ও দোষ চর্চা হতে থাকে, আলোচনায় শরীক না হলেও সে মজলিসে উপস্থিত থাকাটাই অপরাধ।

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়েই সমান অপরাধী।

ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, যে মজলিসে গীবতের সম্ভাবনা থাকে সে মজলিসে যোগদান করা উচিৎ নয়। অবশ্য যদি এমন ধারণা হয় যে,

তার উপস্থিতির কারণে সকলে গীবত থেকে বিরত থাকবে তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই যোগদান করা উচিৎ। কেননা তার ওছিলায় মানুষ একটি পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

আর যদি পূর্ব থেকে কোন ধারণা না থাকে তবে গীবত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে ঐ জঘন্য পাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ মজলিস বর্জন করে চলে আসতে হবে। কোন কারণে তাও যদি সম্ভব না হয় তবে নিজেকে অন্ততঃ সে কুৎসিত আলোচনা থেকে বিরত রেখে জিকিরে মশগুল হয়ে যেতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কারো শারীরিক দোষ-ত্রুটির আলোচনাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

আকল ও বিবেকও একই সিদ্ধান্ত পোষণ করে। কেননা কালো, ধলো-রং ও বর্ণের এই পার্থক্য এবং শারীরিক আকৃতি ও গঠনের বিভিন্নতা মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। এর পিছনেও রয়েছে তাঁর অপরিসীম হিকমত, যা আমাদের সকলের পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব নয়।

এছাড়া কারো শারীরিক দোষ-ত্রুটি আলোচনা করতে যাওয়া প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কুশলতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এ জন্যেই এমন কি কোন সাধারণ বা কুৎসিত প্রাণীকেও ঘৃণা করতে নেই। মনে রাখতে হবে-আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্টিই নিরর্থক নয়। প্রতিটি সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে তাঁর অপার হিকমত।
হযরত ঈশা আলাইহিচ্ছালাম একবার কতিপয় অনুগামী সহ পথে হেটে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর পর দেখা গেলো একটি মৃত কুকুর পড়ে আছে। লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই দুর্গন্ধ সকলের কাছে অসাহা মনে হলো। সকলেই নাক ছিটকাতে শুরু করলেন।

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম তাদের বিরূপ মন্তব্যের জবাবে শুধু এইটুকু বললেন:

কিন্তু কুকুরটার দাঁতগুলি দেখেছো? কেমন সুন্দর ঝকঝকে। প্রকৃত পক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম স্বীয় অনচরদের একথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা

শুধু মন্দ দিকটাই দেখলে। এবং তাই নিয়ে মেতে উঠলে। অথচ আলোচনা করার মত ভালো দিকও ছিলো। কিন্তু সেদিকে তোমাদের কারোরই নজর গেলো না।

—এহয়াউল

উলুম

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু মন্দ ও ভালোর দিক আছে। আমরা যদি মানুষের মন্দ দিকগুলির ব্যাপারে সহনশীলতার পরিচয় দেই এবং ভালো দিকগুলি নিয়েই শুধু আলোচনা করি তবে আমাদের সকলের জন্যই কল্যাণজনক হতে পারে।

হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম একবার একটি কালো কুৎসিত কুকুর দেখতে পেয়ে ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নির্দেশে কুকুরটির জবান খুলে গেলো। মানুষের মতই সে বলে উঠলোঃ

হে নূহ! আমার কুৎসিৎ আকৃতি দেখে তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। কিন্তু তুমি কি জানো যে, আল্লাহই আমাকে এ আকৃতি দিয়েছেন? সৃষ্টির পিছনে আমার ইচ্ছার যদি সামান্যতম দখল থাকতো তবে কিছুতেই আমি এ আকৃতি মেনে নিতাম না। কুকুর হওয়াটাই পছন্দ করতাম না।

কুকুরের মুখে এ ধরণের কথা শুনে নূহ আলাইহিচ্ছালামের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলো। অনুশোচনায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সেই থেকে যখনই এ ঘটনা তার মনে পড়তো অঝোরে কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়তেন। সহজে থামতে চাইতোনা তার সে কান্না।

-নুযহাতুল মাজালিস।

পোষাক সম্পর্কে গীবত:

পোষাক পরিচ্ছদের বিভিন্ন খুঁত খুঁজে বের করা এবং তা রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা করার প্রবনতাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত বেশী।

অনেককেই এ ধরণের আলোচনা করতে শোনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াদারদের মতো লেবাছ পরে, পায়জামা গোড়ালির নিচে পরে থাকে, শেরওয়ানি একটা গায়ে চড়িয়েছে যেন ছালার চট। কাপড় চোপড়ের বাহার দেখে মনে হবে রাজপুত্তুর অথচ খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঘরে ভাত নেই।
কিংবা অমুক মেয়েপেট কাটা ব্লাউজ পরে, বাজারের মেয়েদের মতো শাড়ি পরে, অলঙ্কারগুলি খাঁটি সোনার নয় ইত্যাদি।

যেহেতু এ ধরনের আলোচনা মানুষের মনে ব্যাথা দেয় তাই এটাও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে জনৈকা মহিলার পোষাক সম্পর্কে কিছু একটা মন্তব্য করলেন।

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথেই তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেনঃ

আয়েশা। তুমি মহিলাটির গীবত করেছো। এক্ষুণি থুথু ফেলো।
রসুলুল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক থুথু নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই তাঁর মুখ থেকে একটা গোশতের টুকরা বেরিয়ে এলো।

-তারগীব ওয়াত্তারহীব।

ফকীহ আবুল্লায়ছ গীবত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন:

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে তুমি যদি বল যে অমুকের কাপড় খুব খাট কিংবা বেজায় লম্বা। তবে মনে রেখো যে, এটা গীবত হবে এবং এজন্য কিয়ামতের দিন তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

বংশ সম্পর্কে গীবতঃ

মানুষের চোখে কাউকে খাটো করার নিয়তে কিংবা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ফলানোর উদ্দেশ্যে বংশ ও খান্দান তুলে কথা বলাটাও গীবতের অর্ন্তভুক্ত।যেমন এ ধরণের কথা বলা হয় যে, অমুকের বংশ ভালো নয়, নীচু বংশের লোক, তিন পুরুষ পূর্বে ওরা হিন্দু ছিলো, কৃতদাস ছিলো, ওর মা বাড়ী বাড়ী ঝি গিরি করেছে, ইত্যাদি।

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

দীনদারি ও ভালো আমল ছাড়া কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেনা। অতএব বংশ মর্যাদা নিয়ে বড়াই করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিছুতেই উচিত নয়।

বস্তুতঃ পক্ষে এ ব্যাধি মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন জাতি থেকেই সংক্রমিত হয়েছে। এবং এটা সম্ভবত হতে পেরেছে শুধু এ জন্য যে, আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস ভুলে গিয়েছি। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চির সুন্দর আদর্শ থেকে।

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল ছিলেন হাবসী কৃতদাস। কিন্তু কোরেশ সন্তান দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর তাঁকে সম্বোধন করতেন 'আমাদের সরদার' বলে।

কৃতদাস যায়েদ আল্লার রসুলের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, সমগ্র আরবে তিনি যায়েদ বিন মুহম্মদ রূপে পরিচয় লাভ করলেন।

হযরত উসামা বিন যায়েদ-কে ইসলামী ফৌজের সেনাপতির দায়িত্ব অর্পন করে গিয়েছিলেন স্বয়ং রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অথচ সে সেনা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত খালেদ বিন ওলীদ সাইফুল্লাহর ন্যায় বীর পুরুষ ও কুশলী সমর বিশারদ। এবং হযরত ওমর ও হযরত আবু বকরের মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

মুসলিম জাহানের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাধক পুরুষ ও আলেমকুল শিরোমণি-ই ছিলেন ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসের পুত্র। অনেকেরই উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন অগ্নি-পূজক। কিন্তু গোটা মুসলিম জাতি আজ তাঁদের বিরল প্রতিভার কাছে শ্রদ্ধাবনত। কারো বাপ দাদা কিংবা তিনি নিজেই হয়তো ছিলেন কাপড় বিক্রেতা,

তাতী, কামার, রং ব্যবসায়ী, ধোবী; তালা-চাবি মেরামতকারী ইত্যাদি। কিন্তু এতে তাঁরা ছোট হয়ে যায়নি। বরং অনেকেই গর্ব করে নিজেদের নামের সাথে এ সব ব্যবসায়িক পদবী ব্যবহার করেছেন।

আবার বলছি: ইসলামের দৃষ্টিতে দীনদারি, পরহেজগারি ও ভালো আমলই হচ্ছে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। বংশ মর্যাদা বা অন্য কিছু নয়।

বস্তুতঃ বংশমর্যাদা নিয়ে তারাই শুধু গর্ব করে যাদের গর্ব করার মত কিছু নেই।

শেখ সাদী বড় সুন্দর বলেছেন:

তোমার পূর্ব পুরুষ কোন এককালে শাহী দরবারের ঝাড়ুদার ছিলেন, সেটা আজ বড় কথা নয়, তুমি কি-সেটাই হচ্ছে বড় কথা।

বদ অভ্যাস সম্পর্কে গীবত:

সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় মানুষের মধ্যে রুচি বিরুদ্ধ কিছু বদ অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়, যা অন্যান্যদের কাছে খুবই দৃষ্টি কটু মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হওয়া আরো গর্হিত, আরো ঘৃণ্য। সেটা যদি হয় রুচি বিরুদ্ধ তবে এটা হবে মানবতা বিরুদ্ধ।

এ ধরণের সমালোচনাও গীবত রূপে গণ্য হবে যে, অমুক ব্যক্তি খুবই পেটুক, মানুষের সামনে দাঁত খুটে, খেতে বসে মুখে বিশ্রী রকম শব্দ করে,ঘুমোলে বিশ্রীভাবে নাক ডাকে, দাঁত বের করে হাসে, স্ত্রীর আচল ধরে থাকে, ইত্যাদি।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা একবার সফরে বের হলেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে পথে এক মঞ্জিলে সকলে নেমে পড়লেন। খাদেমকে খাবার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু খাদেম খাবার প্রস্তুত না করেই ঘুমিয়ে গেলো। কেননা পথ চলার ক্লান্তিতে সেও ছিল বিপর্যস্ত।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ঘুম থেকে জেগে উঠে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খুবই বিরক্ত হলেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় উভয়েই তখন অস্থির। পরস্পরে তাঁরা এইরূপ বলাবলি করলেন:

ঘুম ছাড়া এ লোক আর কিচ্ছু জানে না। এখন কি উপায় করা যায়?

পরে তাবা খাদেমকে উঠিয়ে রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু খাবার আনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

খাদেম রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললোঃ

ইয়া রাসুলাল্লাহ। আবু বকর ও ওমর ছালাম আরয করে কিছু খাবার চেয়েছেন।

উত্তরে রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন:

একটু পূর্বেই তো তারা বেশ তৃপ্তি ভরে খেয়েছে।

এ উত্তর শুনে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুম খুবই বিস্মিত হলেন। সাথে সাথেই রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের খিদমতে দৌড়ে গেলেন। আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমরা তো আজ কিছুই খাইনি।

ভাব নিমগ্ন কণ্ঠে রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন: তোমাদের খাদেম যখন ঘুমিয়ে ছিলো তখন তোমরা তার গোশত খেয়েছো। এখনও আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের আলামত দেখতে পাচ্ছি।

ত্রুটি বুঝতে পেরে অনুতাপ বিগলিত কণ্ঠে উভয়ে আরয করলেন:

হে আল্লাহর রসুল। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। এবং আল্লাহর কাছে আমাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করুন।

উত্তরে রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করলেন:

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়। কেননা এখানে বান্দার হক জড়িত। তোমাদের উচিত যে কোন উপায়ে খাদেমকে সন্তুষ্ট করা যেন সে তার দাবী ছেড়ে দেয়.

-দূররে মনছুর।

ছাহাবা কেরামের এক জামাত একবার জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলাবলি করলেন:

বড় অদ্ভুত লোক। খেতে ডাকো, চট করে সবার আগে ভাগেই এসে হাযির। কিন্তু কাজ করতে বলো, তখন দেখবে কুড়ের একশেষ।

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাদের এ আলোচনার কথা জানতে পেরে সকলকে ডাকলেন।

বললেনঃ তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করেছো।

-তারগীব ওয়াত্তারহীব।

একবার হযরত ছালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু এক জায়গায় বসে কিছু আহার করলেন। আহার শেষে সেখানেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে অপর দুজন ছাহাবা অসতর্কতা বশতঃ আপত্তিকর আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন। সেই মুহুর্তে তাদের সতর্ক করে আয়াত নাযিল হলোঃ

"তোমরা একে অপরের গীবত কর না'।

—দুররে মনছুর।

পাপাচার সম্পর্কে গীবত:

'এ ধরণের কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত যে, অমুক ব্যক্তি মদখোর, চরিত্রহীন, বেনামাজি, মিথ্যাবাদী, ঘুষখোর, পিতামাতার অবাধ্য।

শেখ সাদী (রঃ) একবার তার উস্তাদের কাছে গিয়ে জনৈক সহপাঠি সম্পর্কে অভিযোগ করলেন:

হুজুর অমুক সহপাঠী আমার প্রতি অযথা হিংসা পোষন করে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে উস্তাদ উত্তর দিলেনঃ

হে সাদী! তুমি তোমার সহপাঠীর গীবত করছো। আলকোরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন:

"নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"

আদমকে সেজদা না করার অপরাধে আল্লাহ পাকের যে মহা অভিশাপ তার উপর নেমে এসেছে, প্রতিটি আদম সন্তানের উপর দিয়ে সে তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে বদ্ধ পরিকর।

আল্লাহ পাকের সামনেই সে চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে এসেছে:

জিন ও মানুষ দিয়ে আমি জাহান্নাম ভরে ফেলবে।

সেই থেকে একটি মুহুর্তের জন্যও শয়তান বসে নেই। তার প্রতিটি মুহুর্তের একই চিন্তা- এই আদমের সন্তানকে কি করে বিপথগামী করা যায়, আল্লাহর নাফরমানি ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখা যায়।

ইবলিছের শয়তানী জাল এতই সূক্ষ্ম এবং শক্তি তার এতই প্রচণ্ড যে একমাত্র আল্লাহ পাকের হিফাজত ও রহমত ছাড়া মানুষ তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে না। নির্জন গুহায় চল্লিশ বছরের ইবাদত গুজার বান্দাকেও যে কোন মহুর্তে সে বিপথগামী করে ফেলতে পারে।

তাই কোন মানুষকে কখনও কোন পাপে লিপ্ত দেখলে গীবত ও দোষ না করে বরং করুণা ও সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আজ সে শয়তানী চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে পাপাচারের পথ বেয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের পানে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ না করুন আমিও যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি শয়তানের ফাঁদে। তীরে দাঁড়িয়ে

ডুবন্ত মানুষের মর্মান্তিক পরিনতি আমি উপভোগ করছি কিন্তু মনে রাখা উচিত আমার পা ফসকে যেতে পারে যে কোন মুহুর্তে।

এখানে আরেকটা কথা খুবই মনে রাখা দরকার যে, নবী রসুল ব্যতীত কেউ মাসুম, নিষ্পাপ বা দোষমুক্ত নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে কিছু না কিছু দোষ।

মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় আমি সুখ অনুভব করি। অথচ আমার নিজের মধ্যেই রয়ে গেছে কত অসংখ্য দোষ-ত্রুটি। দিন রাত আল্লাহর কত না নাফরমানি হচ্ছে আমার দ্বারা। সে খোঁজ কি আমি রেখেছি? নিজের দোষ আয়েব সম্পর্কে গাফেল থাকা আর শুধু পরের দোষ আয়েব নিয়ে অনর্থক মাতামাতি করা কত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারো কোন দোষ বা পাপ চোখে পড়লে সাথে সাথেই উচিত নিজের মধ্যে বর্তমান দোষ-ত্রুটির কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা ও ইস্তিগফার করা।

পাপকেই শুধু ঘৃণা করা উচিত, পাপীকে নয়। কেননা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে একদিন সে তওবা করে ভালো মানুষ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন তার পূর্বের সকল দোষ-ত্রুটি অন্যদিকে আমি নিজেই হয় তো একদিন সে দোষে লিপ্ত হয়ে পড়বো। তাই আমাদের উচিৎ আল্লাহ পাক যে অনুগ্রহ করে আমাকে এ দোষ থেকে হেফাজত করেছেন এজন্য তাঁর শোকর আদায় করা এবং অন্য সকলকেও যে আল্লাহ এ দোষ থেকে হেফাজত করেন সে জন্য দোয়া করা।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

কোন মুসলমানের গোমরাহীর জন্য এ তিনটি দোষই যথেষ্ট। কারো এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা যে দোষে সে নিজেই লিপ্ত।

নিজের দোষ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে অন্যের দোষ চর্চা করা, (কথায় কিংবা কাজে) অন্যকে কষ্ট দেয়া।

তামবীহুল গাফেলীন

বনী ইসরাইলের দুজন ব্যক্তি ছিলো। একজন সর্বদা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতো। আর অন্যজন থাকতো মদে চুর হয়ে।

স্বভাবতই আবেদ ব্যক্তিটি মদাসক্ত ব্যক্তিকে ঘৃণার চোখে দেখতো। একদিন সে তাকে বলেই বসল:

“জাহান্নাম ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন পথ নাই।“

আবেদের একথা আল্লাহর খুব না পছন্দ হলো। ফলে আল্লাহ উভয়ের অবস্থান পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলেন। আবেদ ব্যক্তি মারা গেলো পাপী অবস্থায়। আর মদাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলো। আবেদকে জাহান্নামে দেওয়া হলো এবং ফাসেককে দেওয়া হলো জান্নাতে।

—আবু দাউদ

পরোক্ষ গীবত:

এ পর্যন্ত গীবতের যে কয়টি প্রকার আলোচিত হয়েছে সেগুলি হলো প্রত্যক্ষ গীবত। কিন্তু গীবত যেমন প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে তেমনি হতে পারে পরোক্ষভাবেও। যেমনঃ

কোন পঙ্গু ব্যক্তিকে অনুকরণ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে অনুকরণ করে চোখ বন্ধ করে চলা, বোবা ব্যক্তিকে অনুকরণ করে ইশারায় ও আকারে ইঙ্গীতে কথা বলা, হাত নেড়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির অনুকরণ করে কথা বলা, ইত্যাদি।

হাদীস শরীফেও এ ধরণের আচরণকে গীবত রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এটাও মানুষের মনে আঘাত দেয়।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার জনৈকা মহিলাকে অনুকরণ করে অঙ্গ-সঞ্চালন করে দেখাচ্ছিলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ আচরণ রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই না পছন্দ হলো। তিনি তাঁর অপছন্দের কথা এভাবে প্রকাশ করলেনঃ

আয়েশা! আমাকে যদি এর বিনিময়ে গোটা দুনিয়াও দান করা হতো তবু আমি এ রকম আচরণ করতে কিছুতেই প্রস্তুত হতাম না।

—এহয়াউল উলুম

পরোক্ষ গীবতের আরেক প্রকার হচ্ছে, নাম উল্লেখ না করে এমনভাবে কারো দোষ আলোচনা করা যাতে উপস্থিত সকলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে সহজেই চিনতে পারে: যেমন:

অনেককেই দেখা যায় গায়ে লম্বা আলখেল্লা চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাতে তছবী, মুখে সফেদ দাড়ি। অথচ তলে তলে শয়তানি আর বদমাশি। অনেক মুছল্লির কথাই জানি, কপালে বড় বড় দাগ ফেলে দিয়েছে অথচ। কারো কারো গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, পাশে গেলে গা বমি করে।

অনেক চতুর ব্যক্তি গীবতের জন্য আরো শিল্প সম্মত পন্থা উদ্ভাবন করেছে। তাদের কথা শুনলে বাহ্যত মনে হবে নিজের সম্পর্কেই বুঝি কিছু বলা হচ্ছে অথচ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কাউকে ঘায়েল করা।

যেমন: 'চুরি করা আমার অভ্যাস নয়, মেয়েদের দেখলেই আমার জিভে লালা ঝরে না, ঘুমটা ফেলে বুক ফুলিয়ে চলা আমাদের অভ্যাস নয়।'

মোট কথা নাম উল্লেখ না করেও মানুষকে হেয় করার নিয়তে যা বলা হবে, যা করা হবে তা গীবত রূপেই বিবেচিত হবে। এবং কিয়ামতের দিন গীবতের জন্য নির্ধারিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে।ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সুবিচার লাভের উদ্দেশ্যে শাসকের কাছে অধীনস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে। এটা গীবত রূপে গণ্য হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থেকে জুলুম মেনে নিলে নিজের হক নষ্ট হবেই, উপরন্তু জালেমকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে জুলুমও বৃদ্ধি পাবে।

পক্ষান্তরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফলে জালিম তার জুলুমের উপযুক্ত সাজা লাভ করবে এবং মানুষও তার জুলুম-অত্যাচার থেকে নাজাত পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

দুররে মানছুর কিতাবে বলা হয়েছে—
"জালিমের বিরুদ্ধে কথা বলা, অভিযোগ তুলে ধরা, তদ্রূপ মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কোনো ফাসেক ও পাপাসক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করে দেওয়া গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।"

দুররে মানছুর।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে—

আল্লাহ পাক কারো দোষ প্রকাশ করে দেওয়া পছন্দ করেন না। তবে মজলুমের জন্য সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরার অবকাশ রয়েছে। যেমন—অমুক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আমার জমি ভোগদখল করেছে, কিংবা আমার আমানতের টাকা আত্মসাৎ করেছে, ইত্যাদি।

মোটকথা—যে কোনো প্রকারে জুলুমের কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে; এটা গীবত রূপে গণ্য হবে না।

সংশোধনের উদ্দেশ্যে—

কাউকে যদি কোনো দোষ বা পাপে লিপ্ত দেখা যায়, তখন সে কথা এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে যার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির সংশোধন হবে বলে আশা করা যায়। এটা গীবত নয়; কারণ এখানে তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয়, বরং হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ কামনাই মুখ্য।

যেমন:সন্তানের কোনো দোষ পিতা-মাতার কাছে বলা, ছাত্রের দোষ শিক্ষকের কাছে প্রকাশ করা, কিংবা উৎকোচ গ্রহণের কথা শাসকের কানে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি।

এ আলোচনাটুকু এহইয়াউল উলূম থেকে নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রিয় ছাহাবী হযরত ছাদকে কুফার শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন।

কিছুদিনের মধ্যেই একদল কুফাবাসী মদিনায় এসে হযরত ওমরের কাছে তার নব নিযুক্ত শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো।হে খলিফাতুল মুসলিমীন! আপনি এমন এক ব্যক্তিকে আমাদের শাসক রূপে নিযুক্ত করেছেন যে সুন্নত মোতাবেক নামায পড়ে না।

খলিফা হযরত ওমর (বিশেষ দিক বিবেচনা করে) হযরত ছা'দের স্থলে অপর ছাহাবী হযরত আম্মারকে কুফার শাসক নিযুক্ত করলেন।

অবশ্য কুফাবাসীদের অভিযোগ ছিলো সম্পূর্ণ অমূলক। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, খলিফা হযরত ওমর তাহাদের অভিযোগ শুনেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন।

এটা গীবত হলে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছুতেই তাদের কথায় কর্ণপাত করতেন না। বরং কঠোর ভাষায় তিরস্কারের মাধ্যমে তাদেরকে গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন।

হযরত ওমর নিজেই একবার স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ বিন ওমরের বিরুদ্ধে রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এই মর্মে অভিযোগ করেছিলেন যে, আবদুল্লাহ তাঁর কথা মানছে না (মতানৈক্যের কারণে)।

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহকে ডেকে (নিজের মত পরিহার করে) মা-বাবার কথা মেনে চলার উপদেশ দিলেন। (এবং হযরত আবদুল্লাহ ও অম্লান বদনে উপদেশ মোতাবেক আমল করলেন)।

—আবু দাউদ।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পথে ছালাম করলেন। হযরত উসমান তখন খুব অন্যমনস্ক ছিলেন। ফলে হযরত ওমরের ছালাম তিনি শুনতে পাননি।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনক্ষুণ্ণ হয়ে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বিচার দায়ের করলেন।

খলিফা হযরত আবুবকর তখন হযরত ওসমানকে ডেকে ছালামের জবাব দানের জন্য নছীহত করলেন।

—মোল্লা আলী ক্বারী।

প্রসংগক্রমে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ যামানার মুসলমানদের মধ্যে ছালামের অভ্যাস প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দু একজন যারা এখনও ছালামের সুন্নত জীবিত রেখেছেন তারাও ছালামের অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে উদাসীন। শুধু সামাজিক প্রথা হিসাবেই যেন তারা এ কাজটি করে থাকেন।

হাদীস শরীফে অত্যন্ত তাগিদের সাথে বার বার ছালামের অভ্যাস গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে : তোমরা ব্যাপক ভাবে ছালামের অভ্যাস গড়ে তোল। কেননা ছালামের মাধ্যমেই হৃদয়ে হৃদয়ে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

সিরিয়ার শাসনকর্তা একবার হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আবু জান্দাল নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে পাঠালেন।

আবু জান্দাল ছিল মদ্যপ ব্যক্তি। দিন রাত মদে চুর হয়ে থাকতো সে। শাসনকর্তা সাধ্যমত চেষ্টা করেও পথে আনতে সক্ষম হননি তাকে।

খলিফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অভিযোগ শুনে আবু জান্দালকে অত্যন্ত কঠোর ভাষার তিরস্কার করে, পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি লিখে পাঠালেন। এই পবিত্র কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, ক্ষমা প্রদর্শনকারী ও তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি প্রদানকারী ও ক্ষমতাবান।

হযরত ওমরের এ চিঠি আবু জান্দালের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলো তার অন্তর। সেই মুহূর্তে মদ পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণ তওবা করলেন তিনি।

—এহয়াউল উলুম।

এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা সুস্পষ্ট রূপেই একথা প্রমাণ করে যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে মানুষের দোষ প্রকাশ করার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে দোষ এমন ব্যক্তির কাছে কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে না যে সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে না।

হযরত ইবনে সীরীনের মজলিসে জনৈক ব্যক্তি একবার লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার নায়ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তীব্র সমালোচনা শুরু করলো।

হযরত ইবনে সীরীন উক্ত ব্যক্তির দিকে গজবের দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন : চুপ হও। তুমি গীবত করছো। কেননা তুমি জানো যে, হাজ্জাজকে সংশোধন করার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং এটা অনর্থক দোষ চর্চা হচ্ছে।

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে :

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দোষ প্রকাশ করার অনুমতি ও শরীয়ত দিয়েছে। যেমন : কেউ হয়ত কোন অবিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে টাকা আমানত রাখতে যাচ্ছে; এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অবিশ্বস্ত তার কথা প্রকাশ করে দেয়া যেতে পারে। কিংবা কোন ভালো চরিত্রবান লোক কোন বদ স্বভাবের লোকের সাথে উঠা-বসা করছে, এরূপ ক্ষেত্রে এই বলে তাকে সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে যে, এ লোক ভালো স্বভাবের নয়। এর সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

তদ্রুপ কারো মধ্যে যদি কৌটিনামির স্বভাব থাকে কিংবা টাকা ধার নিয়ে তা পরিশোধ না করার অভ্যাস থাকে তবে সেকথাও মানুষকে জানিয়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে। কেননা মানুষ তখন উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে এবং তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে :

"তোমরা কি পাপাাসক্ত ব্যক্তির সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে চাও? না, বরং তাকে অপদস্থ করো। সকলের সম্মুখে তার মুখোশ উন্মোচন করে দাও, যেন মানুষ তার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেতে পারে।"

— এহয়াউল উলুম।

কেউ যদি পরামর্শ চায় তখন তার কাছে সত্য গোপন করা উচিত নয়।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে : যার কাছে কোন পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়া উচিত।

ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে হযরত মুআবিয়া ও হযরত আবু জাহাম এর পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো।

তিনি তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন।

আল্লাহর রাসূল তখন স্পষ্টভাবে বললেনঃ

মুয়াবিয়া খুবই দরিদ্র ব্যক্তি। তাকে বিয়ে করা তোমার জন্য ভালো হবে না। অন্যদিকে আবু জাহাম হচ্ছে রুক্ষ মেজাজের লোক। মারধর করা তার স্বভাব। এর চেয়ে উসামা বিন যায়েদকে তুমি বিয়ে করো।

—জাওয়া হেরুতাফসীর।

এখানে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি লুকিয়ে লোক চক্ষুর অগোচরে কোন পাপ কাজে লিপ্ত থাকে, যা অন্যান্যদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার ভয় নেই এবং তার পাপ কাজের কারণে অন্য কারো ক্ষতিও হচ্ছে না তখন মানুষের কাছে তার দোষ প্রকাশ করে দেয়া কিছুতেই বৈধ নয়। কেউ যদি এরূপ করে তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রতিরোধের জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সকলের সম্মুখে তার প্রকাশ করে দিবেন।

—নুযহাতুল মাজালিস।

লজ্জাহীন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করাঃ

যার নির্লজ্জতা এতদূর গড়িয়েছে যে, প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত হতে সে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না বরং গর্বই অনুভব করে। এরূপ ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা যেতে পারে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে তার দোষ আলোচনা করা গীবত নয়।"

—মোল্লা আলী ক্বারী।

শেখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন :

তিন শ্রেণীর মানুষের দোষ আলোচনা করা অপরাধ নয়।

- ❖ নির্লজ্জ ব্যক্তি, যে নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে।
- ❖ অত্যাচারী শাসক; যার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।
- ❖ দুষ্ট লোক, যার দুষ্কৃতি মানুষের ক্ষতি সাধন করছে; অথচ অজ্ঞতা বশত : মানুষ সতর্ক হতে পারছে না। যেমন : ওজনে ফাঁকিবাজ ব্যবসায়ী।

কোন অপরিচিত ব্যক্তির কিংবা (নামোল্লেখ না করে) পরিচিত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বা অন্য কোন প্রকারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গীবত হয়ে যাবে।

—দুররে মোখতার।

তবু এখানে একটা কথা থেকে যাচ্ছে। যেহেতু এ ধরণের দোষ আলোচনায় নিজের ও অন্যের মূল্যবান সময়ের অপচয় ছাড়া বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না তাই এ ধরণের নিরর্থক আলোচনা থেকেও যথা সম্ভব নিজেকে বিরত রাখাই উত্তম।

অনেক সময় মানুষ কারো বিশেষ কোন শারীরিক বা অন্যান্য দোষ ধরে ডাকতে শুরু করে। এমনকি পরে তার আসল নামই চাপা পড়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সে নাম ধরে ডাকার অনুমতি রয়েছে। এটা গীবত রূপে গণ্য হবে না।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন মশহুর মুহাদ্দিসকে আমাশ (পঙ্গু) নামে উল্লেখ করা হয়। কেননা আসল নামটি হারিয়ে গিয়ে এ নামেই এখন তিনি পরিচিত হয়ে গেছেন। (এহয়াউল উলুম)

ধর্মের ক্ষতি হচ্ছে যার দ্বারা তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেয়া উচিত। যেন মানুষ তার গোমরাহী সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারে।

উপরোক্ত কারণেই ভণ্ডপীর তথা ধর্ম ব্যবসায়ীদের সমালোচনা করা হয়।

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে :

মানুষের ইবরত ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তির গোপনীয় দোষ বা মর্মান্তিক পরিণতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এটা গীবত বলে বিবেচিত হবে না। যেমনঃ এ ধরণের কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি কথায় কথায় মিথ্যার আশ্রয় নেয় ফলে কেউ এখন তার কথা বিশ্বাস করে না। অমুক ব্যক্তি মদখোর কিংবা সুদখোর ছিলো। মৃত্যুর সময় তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল, কেউ তার জানাযায় শরীক হয়নি।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের ইবরত ও শিক্ষাই যেন উদ্দেশ্য হয়। কাউকে হেয় করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। আল্লাহ পাক মানুষের মনের গোপনতম কথা ও জানেন। সেখানে লুকোচুরি খেলার কোন উপায় নেই।

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। উপস্থিত সকলের ইবরত ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বললেন :

এ কবর দুটির উপর ভীষণ আযাব হচ্ছে। কেননা একজন কোটনামি করতো। আর অপরজন খোলা জায়গায় পেশাব করত।

—তিরমিযী।

এক আনছারী ছাহাবীর বোনের ইন্তিকাল হলো। দাফন-কাফন শেষে বাড়ীতে এসে হঠাৎ তার স্মরণ হলো, টাকার থলেটি কবরের ভিতরে রয়ে...

পুনরায় তিনি কবর স্থানে গিয়ে কবরের মাটি খুড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন- কবরের ভিতরে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মাটি চাপা দিয়ে কোনক্রমে বাড়ী এসে পৌঁছলেন তিনি। মায়ের কাছে খুলে বললেন সমস্ত ঘটনা। মা বললেনঃ

তোমার বোনের তেমন কোন দোষ ছিলো না। তবে তার কূট নামির স্বভাব ছিলো। নামাজ খুব বিলম্ব করে পড়তো। এবং তাহারাত ও পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ছিলো না। মনে হয় এ জন্যই তার কবরে আযাব হচ্ছে।

—তামবীহুল গাফিলীন

আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেছেনঃ

একবার হজ্জের ছফরে এক ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় হলো। লোকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ার কারণ ছিলো- অনবরত সে দরূদ শরীফ পড়তো। আমি তাকে কাছে ডেকে এনে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে তখন আমাকে একটি ঘটনা বললো। বড়ই শিক্ষণীয় ঘটনা যা আজো আমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত আছে। সে বললোঃ অনেক দিন আগে আমি একবার আমার পিতার সাথে হজ্জে যাচ্ছিলাম। হজ্জের পর ফিরতি পথে এক মঞ্জিলে উভয়েই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি— কে যেন বলছেঃ শীঘ্রই উঠো। তোমার পিতার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। জেগে দেখি সত্যি সত্যি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা আমাকে বজ্রহতের মতই স্তব্ধ করে দিলো।

আল্লাহর নাফরমানীর কারণে তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

বেদনা ভারাক্রান্ত মনে কখন এক সময় আবার আমার চোখে ঘুম নেমে এলো। স্বপ্নে দেখি—কুৎসিত, কালো, ভীষণ দর্শন চারজন লোক লৌহডান্ডা হাতে আমার পিতাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই আল্লাহর রহমত রূপে চাঁদের মত উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের অধিকারী, অত্যন্ত সুদর্শন এক আল্লাহর বান্দা এসে উপস্থিত হলেন।

তেড়ে আসা ভীষণ দর্শন লোকগুলি যে যেদিকে পারলো পালিয়ে বাঁচলো।

মহিমান্বিত আগন্তুক তখন আমার পিতার মাথায়-মুখে সস্নেহে তাঁর উজ্জ্বল কোমল হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ দেখো! তোমার পিতার মুখমন্ডল কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
আমি বিনয়ী কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলামঃ
কে আপনি হে মহানুভব! হে কল্যাণকামী!
উত্তরে তিনি এরশাদ করলেনঃ
আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! তোমার পিতা সর্বদা আমার উপর দরূদ পাঠাতো। তাই তার বিপদের সময় আমাকে আসতে হলো।
সেই মূহূর্তে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। দেখি—সত্যি সত্যি আমার পিতার মুখমণ্ডল চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠেছে। চারিদিকে একটা অপূর্ব সৌরভ ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ পাকের অপার রহমত ও করুণা দর্শনে অভিভূত হয়ে আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম।
সেদিন থেকে নিজের জন্য আমি দরূদ পাঠ জরুরী করে নিয়েছি।

—এহয়াউল উলুম
এ ঘটনা থেকে একথা জানা গেল যে, ইবরত ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা যেতে পারে। সেটা গীবত নয়। কেননা তা হলে হযরত আবদুল ওয়াহেদ তাকে অবশ্যই বাধা দিতেন।
আমার প্রিয় ভাই! তুমিও আজ থেকে দরূদ পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ব্রতী হও। এটা আল্লাহর রসূলের প্রতি মহব্বতের আলামত। এতে তোমার নিজেরই কল্যাণ। (দরূদ পাঠের মাধ্যমে তুমি কত অসংখ্য কল্যাণ ও নেয়ামতের অধিকারী হয়ে যাবে তা দুনিয়ার এই ক্ষুদ্র পরিসরে বসে কল্পনা করার সাধ্য নেই তোমার।)
কত আফসোসের বিষয়, রসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম আলোচিত হওয়ার পরও অনেকেই দরূদ পাঠ করে না। এর চেয়ে বদ নছিব-হতভাগ্য আর কে হতে পারে।

গীবতের স্বরূপ :

গীবতের কুৎসিত ও কদর্যরূপ একটি উদাহরণের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পরস্পরের গীবতে লিপ্ত না হয়। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এটা যেমন তোমরা ঘৃণা কর, গীবত সম্পর্কেও তোমাদের তেমনি ঘৃণা বোধ করা উচিত।

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তফীরে মাআলেমুত্তানযীল গ্রন্থে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সফরের সময় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দুজন সচ্ছল ছাহাবীর সাথে একজন অসচ্ছল ছাহাবীকে দিয়ে দিতেন।

তিনি সে দুজনের সেবা করতেন। আর তাঁরা এর সফরের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করতেন।

এক সফরে হযরত ছালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দুজন ছাহাবীর সাথে দেয়া হলো।

পথে এক মঞ্জিলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। হযরত ছালমান ফারসীকে খাবার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে সে দুজন ছাহাবী অন্যত্র চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা ফিরে এসে দেখেন- খাবার প্রস্তুত করা হয়নি। ছালমান ঘুমিয়ে আছেন।

তখন তাঁরা ছালমানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাবারের খোঁজে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

আল্লাহর রাসূলের কাছে তখন কোন কিছু ছিলো না। তাই তিনি তাঁকে উসামার কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে বললেন।

হযরত উসামা জানালেন। খাওয়ার মত কোন কিছু আমার কাছে নেই।

ফিরে এসে ছালমান উভয়কে জানালেন যে, উসামার কাছে কিছু পাওয়া যায়নি।

উভয়ে উসামার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন। আসলে উসামা খুব কৃপণ স্বভাবের।

এবার সালমানকে তারা অন্যত্র পাঠালেন। সেখান থেকেও সালমান খালি হাতে ফিরে এলেন। সালমানের অনুপস্থিতিতে তাঁর কথাও আলোচিত হলো।
পরে উভয়ে রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন উভয়কে লক্ষ্য করে আল্লাহর রসুল বললেনঃ তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের আলামত দেখা যাচ্ছে।
বিস্ময়াহত কণ্ঠে উভয়ে বললেনঃ
হে আল্লাহর রসুল! আজ আমরা গোশত খাইনি। এমন কি কোন খাদ্য দ্রব্যই স্পর্শ করিনি।
রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ একটু পূর্বেই তোমরা উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছো। কেননা তোমরা তাদের গীবত করেছো।
তখনই মুসলমানদেরকে গীবতের ভয়াবহতা ও কদর্যতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে উপরের আয়াতটি নাযিল হয়।
উপরোক্ত আয়াতে ও বিভিন্ন হাদীসে গীবত ও দোষ চর্চাকে মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির গলিত ও দুর্গন্ধময় লাশ থেকে গোশত কেটে এনে খাওয়াটা যেমন ঘৃণ্য মনে হয়, কারো গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হওয়াও তেমনি ঘৃণ্য হওয়া উচিত।
অন্য কয়েকটি হাদীসে গীবতকে জীবিত ব্যক্তির গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ
একটু পূর্বেই তোমরা ওসামা ও ছালমানের গোশত খেয়েছ।
কেননা কারো শরীর থেকে গোশত কেটে খাওয়াটা যেমন নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার পরিচয়, কারো গীবত ও দোষ চর্চা করাটাও তেমনি এক হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। কারণ প্রথমটায় মানুষের শরীর জখম হয় আর দ্বিতীয়টায় জখম হয় মানুষের অন্তর।
বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত মাইজ রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা 'যিনার' অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথে আখেরাতের ভয়ে কম্পমান সেই পুণ্যাত্মা ছাহাবী রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন :

হে আল্লাহর রসূল! আমার দ্বারা এ অপরাধ হয়ে গেছে। এখন আমাকে পবিত্র করে দিন।

আল্লাহর নবী বার বার তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। একবার বললেন : হয়ত তুমি শুধু স্পর্শ করেছ। আবার বললেন : হয়ত তুমি শুধু চুম্বন করেছ।

তবু হযরত মাইজ তাঁর পূর্ব স্বীকারোক্তিতে অটল রইলেন। তিনি বললেন :

হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়ার কোন শাস্তিকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর সামনে যেমন আমাকে লজ্জিত না হতে হয়।

ইসলামী বিধান মোতাবেক হযরত মাইজকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে হত্যা করা হলো।

অপর দুজন সাহাবী তখন পরস্পর এরূপ আলোচনা করছিলেন : দেখো! আল্লাহ পাক এর দোষ গোপন করেছিলেন! কিন্তু নিজেই সে তা প্রকাশ করে দিলো এবং কুকুরের মতো অপমানজনক মৃত্যু বরণ করলো।

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ আলোচনা শুনছিলেন। কিন্তু তক্ষুণি তিনি কিছু বললেন না।

কিছু দূর পর দেখা গেলো—পথের পাশে এক মৃত গাধা পড়ে আছে। গলে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁদের ডেকে বললেন :

তোমাদেরকে এ মৃত গাধার গলিত লাশ থেকে গোশত খেতে হবে।

উভয়ে বিনীত ভাবে আরয করলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি করে সম্ভব?

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন : একটু পূর্বেই তোমরা মাইজের গীবতে লিপ্ত ছিলে। অথচ কারো গীবত করা এই মৃত গাধার গোশত খাওয়ার চেয়েও ঘৃণ্য।

অতঃপর রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইজের মর্যাদা সম্পর্কে এরশাদ করলেন :

আল্লাহর কসম মাইজ এখন জান্নাতের মনোরম উদ্যানে বিচরণ করছে।

—আবু দাউদ।

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর রসূল এরশাদ করেছেন :

(গীবত যিনা বা অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ।)

সাহাবাগণ আরয করলেন : হে আল্লাহ্র রসূল! এটা কি ভাবে হতে পারে?

এরশাদ হলো : কেননা যিনা থেকে মানুষ তওবা করে কিন্তু গীবত থেকে তওবা করে না।

অর্থাৎ সমাজের সকলেই যিনাকে একটি ঘৃণ্য পাপ মনে করে তাই সকলে এ অপরাধ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। কখনও যদি এ অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন অনুতপ্ত মনে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করে।

পক্ষান্তরে গীবতকে যেহেতু কোন পাপই মনে করা হয় না। তাই মানুষ এ থেকে বাঁচার কথা চিন্তাও করে না। ফলে তা যিনার অপরাধকেও অতিক্রম করে যায়।

হযরত মায়মুন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবনে কখনও তিনি কারো গীবত করেননি এবং কোন গীবতের মজলিসে উপস্থিত থাকেননি।

—মাআলেমুত

তানযীল।

সেখ সাদী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গুলিস্তায় লিখেছেন :

এক রাত্রে আমি আমার পিতার সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলাম। আমাদের পাশে কিছু লোক ঘুমিয়ে ছিল।

আমি বললাম : এরা এমন ভাবে ঘুমিয়ে আছে, মনে হয় যেন মরেই গেছে। এরা যদি উঠে দুরাকাত নামায পড়ে নিতো তবে কত ভালো হতো।

আমার পিতা বললেন : কিন্তু তুমি যদি নামাজ না পড়ে ওদের মত ঘুমিয়ে থাকতে তবে কত ভালো হতো। গীবত ও দোষ চর্চার পাপ থেকে অন্তত বেঁচে যেতে।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মুআয আরবাযী বলেছেন :

তিনটি গুণ যদি তোমার মধ্যে থাকে তবে তোমাকে মুহসিনদের (পূত-পবিত্রদের) কাতারে শুমার করা হবে। এবং তুমি আল্লাহ পাকের ভালোবাসা লাভ করবে। কেননা আল্লাহ পাক মুহসিনদের ভালোবাসেন। সে তিনটি গুণ হলো—

কারো উপকার করতে না পারো, ক্ষতি করো না।

কাউকে সুখ দিতে না পারো, দুঃখ দিও না।

কারো প্রশংসা করার মত মনের উদারতা যদি তোমার না থাকে, তবে অন্তত দোষ চর্চা করো না।

এ তিনটি গুণ যদি তোমার মধ্যে না থাকে। উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করা, প্রশংসার পরিবর্তে দোষ গেয়ে বেড়ানো এবং মানুষকে দুঃখ দেয়াই যদি হয় তোমার স্বভাব, তবে শুনে রাখো, জাহান্নামের কঠিন আযাব তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। হাশরের মাঠে সকলেই তোমাকে ঘিরে ধরবে। মহান বিচারকের দরবারে ফরিয়াদ জানাবে তোমার বিরুদ্ধে।

এখন নিজেকেই তোমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হাশরের মাঠে সকলের সামনে লজ্জিত হওয়া যদি পছন্দ করো তবে মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হতে পারো। কিন্তু সেটা যদি পছন্দ না হয় তবে কাউকে কষ্ট দিও না এবং কারো গীবত করো না।

—তাম্বীহুল গাফিলীন।

হযরত কাআব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : গীবত এমনই গর্হিত অপরাধ যে, গীবতকারী যদি তওবা করে মৃত্যুবরণ করে তবু সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার সৌভাগ্য না হয় সকলের পূর্বে সে-ই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

—কিমিয়ায়ে সাআদাত।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আল্লাহ পাকের যিকিরে সর্বদা মশগুল থাকো। কেননা যিকির হচ্ছে আত্মার সকল ব্যাধির উপশম। অতঃপর গীবত থেকে নিজেকে হিফাজত করো। কেননা গীবত একটি সর্বনাশা ব্যাধি।

—এহয়াউল উলুম।

হযরত আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:
পৃথিবীতে যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কেয়ামতের দিন তাকে বলা হবে: এ মৃত দেহ থেকে গোশত কেটে তোমাকে খেতে হবে। কেননা দুনিয়াতে তুমি এর গোশত খেয়েছো।
একথা শুনে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সে পিছিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় সেদিন থাকবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে তা খেতে হবে।
—তারগীব ওয়াততারহীব।
হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:
মানুষ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে যেমন ঘৃণা বোধ করে, তেমনি ঘৃণা বোধ করা উচিত গীবত ও দোষ চর্চা সম্পর্কেও।
—জালালাইনের হাশিয়া।
হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই নছিহত করে বলতেন:
যখন তোমার কারো দোষ চর্চা করার লোভ হয় তখন নিজের মধ্যে বর্তমান দোষগুলির কথা একবার ভেবে নিও। ফলে তুমি গীবত থেকে বেঁচে যাবে।
হযরত জয়নুল আবেদীন বলেছেন : গীবতের আবর্জনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। কেননা গীবতকারী হচ্ছে মানুষরূপী কুকুর।
—কিমিয়ায়ে সাআদাত।
কুকুরের স্বভাব হচ্ছে মৃত লাশ নিয়ে কামড়া কামড়ি করা। গীবতকারীরাও মানুষের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। এজন্যই হযরত জয়নুল আবেদীন গীবতকারীকেও কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন।
মুহাম্মদ ইবনুল আরবী মাসনাদে ইমাম আযম গ্রন্থে লিখেছেন :
হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনে কখনও কারো গীবত করেননি, আলোচনা করেননি কারো সামান্যতম কোন দোষের কথা।
জাহান্নামে কিছু লোকের ভীষণ চুলকানি হবে। এমনকি শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে গোশত খসে পড়ে যাবে। তারা বলবে : হে পরওয়ারদিগার এ বিশেষ শাস্তি আমাদেরকে কি অপরাধের জন্য দেওয়া হচ্ছে।

উত্তরে বলা হবে : দুনিয়াতে তোমরা মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত ছিলে। মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করাই ছিলো তোমাদের কাজ। তাই আল্লাহ পাক তোমাদের দেহে কষ্টদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে আযাব দিচ্ছেন।

—এহয়াউল উলুম।

হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাউকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সমালোচনা করতে শুনলে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন : তুমি কি হাজ্জাজের সামনে এ কথাগুলো বলতে পারবে?

না সূচক উত্তর পেলে তিনি বলতেন : সামনা সামনি প্রশংসা এবং পশ্চাতে গীবত ও দোষ চর্চা— এটাকে আমরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় মুনাফেকী মনে করতাম।

—এহয়াউল উলুম।

আজকাল অনেকের মধ্যে মুনাফেকীর অভ্যাস দেখা যায়। বিশেষ করে শাসকবর্গের আশে পাশে এই শ্রেণীলোকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অভিজাত সমাজে তো এটা এখন একটা আর্ট বা শিষ্টাচার হিসাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এ ধরণের মুনাফেকী থেকে হেফাজত করুন এবং স্পষ্টভাষী হওয়ার তওফীক দান করুন।

হযরত হাতেম আছাম বলেছেন : গীবতকারী জাহান্নামে বানর রূপে এবং হিংসুক ব্যক্তি শূকর রূপে আযাব ভোগ করবে।

—নুযহাতুল মাজালিস।

হযরত ফোজায়েল বিন ইয়াজ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন :

যদি জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নাজাত পেতে চাও তবে কারো গীবত করে নিজের মুখকে তুমি অপবিত্র করো না। যদি তুমি গীবতের অপবিত্রতা থেকে নিজেকে হিফাজত করতে ব্যর্থ হও তবে মনে রেখো, নিজের হাতেই তুমি তোমার আখেরাত বরবাদ করলে এবং মানুষের অন্তরে এমন ক্ষত সৃষ্টি করলে যা কোন দিন শুকোবে না।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এক সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় বলেছেন : তাঁর ধনুকের ক্ষত খুব দ্রুত শুকিয়ে যায়। কিন্তু জিহ্বা দ্বারা মানুষের অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা কোনদিন শুকায় না।

হযরত খালেদ রিবঈ একবার মসজিদে বসা ছিলেন। একদল লোক সেখানে গীবত চর্চায় লিপ্ত ছিল। হযরত খালেদ তাদেরকে গীবত থেকে...বিরত রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়লেন গীবতের আলোচনায়।

সে রাত্রেই তিনি স্বপ্নে দেখেন—এক ব্যক্তি তাঁর সামনে শুকরের গোশত এনে বলছে : হে খালেদ! তোমাকে শুকরের গোশত খেতে হবে।

তিনি বললেন : অসম্ভব! হারাম গোশত আমি কি করে খেতে পারি?

লোকটি উত্তরে বললো : অথচ তুমি ত আজ মানুষের গোশত খেয়েছো। সেটা কি হালাল ছিল?

এরপর লোকটি বলপূর্বক হযরত খালেদের মুখে শুকরের গোশত পুরে দিলো।

হযরত খালেদ বলেছেন : সেদিন থেকে একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শুকরের গোশতের দুর্গন্ধ এসেছে। এই চল্লিশ দিন আমি কোন মানুষের সাথে দেখা করতে পারিনি।

—তাম্বীহুল গাফিলিন।

হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন : তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তুমি তার সম্পর্কে এমন আলোচনাই করো যে ধরণের আলোচনা নিজের জন্য তুমি পছন্দ করো।

অর্থাৎ তোমার অনুপস্থিতিতে কেউ তোমার দোষ চর্চা করুক—এটা যেমন তোমার পছন্দ নয়, তেমনি তুমিও কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চায় লিপ্ত হতে যেওনা।

হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন :

প্রতিটি মানুষের সাথে অসংখ্য ফিরিশতা থাকে। সে যখন কারো প্রশংসা করে তখন ফিরিশতাগণ প্রফুল্ল হয়ে বলতে থাকে : আল্লাহ তোমাকে ও এরকম করে দিন।

আর সে যখন কারো দোষ চর্চায় লিপ্ত হয় তখন ফিরিশতাগণ বলতে থাকে : হে আদমের বেটা! আল্লাহ তোমার দোষ লুকিয়ে রেখেছেন। অথচ তুমি মানুষের দোষ প্রচার করে বেড়াচ্ছ। বিরত হও এবং আল্লাহ পাকের প্রশংসায় মগ্ন হও।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে : নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :

কেউ যদি কারো কোন দোষ দেখেও তা লুকিয়ে রাখে তবে বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিবেন।

—এহয়াউল উলুম।

আরো এরশাদ হয়েছে : গীবত ঈমানকে ক্ষয় করে ফেলে। (এবং তা ক্ষয় হতে হতে এক সময় এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে তার অন্তরে এক তিল পরিমাণ ঈমানও তখন আর অবশিষ্ট থাকেনা। ফলে মৃত্যুর সময় তার কলেমা নছীব হয়না। আমাদের সকলকে আল্লাহ হেফাজত করুন।)

—সিরাতে আহমদিয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গীবতের ফল

গীবত প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য ক্ষতি ও ধ্বংসই শুধু ডেকে আনে। আর যার গীবত করা হয় তার জন্য ডেকে আনে কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গল। এ জন্যই এক বুজুর্গ বলেছেন :

যদি কারো গীবত ও দোষ চর্চা করার এতই সাধ হয় তবে আপন মায়ের গীবত করাই উত্তম। কেননা এতে তাঁর কল্যাণ হবে।

গীবত মানুষের জন্য কি কি ক্ষতি ও কল্যাণ ডেকে আনে এখানে সংক্ষেপে আমরা তাই আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

দোয়া কবুল না হওয়া :

যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত থাকে আল্লাহ পাকের দরবারে সে এতই ঘৃণ্য ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হয় যে তার কোন দোয়াই কখনও কবুল হয় না। এবং তওবা করার পূর্বে পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রহমত ও করুণা থেকে সে বঞ্চিত থাকে।

ফকীহ আবদুল্লাহ বলেছেন : তিন ব্যক্তির দোয়া কিছুতেই কবুল হয় না।

হারাম খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণকারী ব্যক্তি।

গীবতকারী ব্যক্তি।

হিংসুক ও কৃপণ ব্যক্তি।

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামকে জিজ্ঞাসা করা হলো : আমরা দোয়া করি অথচ আমাদের দোয়া কবুল হয় না। এর কারণ কি?

তিনি বললেন : তোমাদের দোয়ায় প্রাণের স্পর্শ নেই কেননা হৃদয় তোমাদের মৃত। ফলে আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।

আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : অন্তর বা কলব মৃত হয় কি কারণে?

উত্তরে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম বললেন :

তোমাদের মধ্যে বড় বড় আটটি দোষ আছে যা কলবের সজীবতা নষ্ট করে দেয়ঃ

১। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে তোমরা ভোগ করছো। অথচ সামান্যতম কৃতজ্ঞতা বোধও নেই তোমাদের অন্তরে।

২। সর্বদা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর। অথচ সে অনুযায়ী আমল কর না।

৩। মুখে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবী করে বেড়াও। অথচ তোমাদের জীবনের সব কিছু রাসূলের সুন্নত পরিপন্থী। ভালোবাসার স্বাভাবিক দাবী ত এই যে, তাঁর বাতানো তরীকাতেই তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে।

৪। মৃত্যু এক অবধারিত সত্য এবং মৃত্যু থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। একথা তোমরা বেশ ভালো করেই জানো। অথচ অন্তরে তোমাদের মৃত্যুর কোন ভয় নেই। মৃত্যুর ভয় থাকলে সেজন্য অবশ্যই তোমরা প্রস্তুতি নিতে।

৫। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন : শয়তান তোমাদের চির শত্রু। অতএব শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থেকো। অথচ শয়তানকেই তোমরা নিজেদের বন্ধু বলে ধরে নিয়েছো।

৬। জাহান্নামের কথা মুখে আলোচনা করো অথচ জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার কোন তাড়না তোমাদের মধ্যে নেই।

৭। জান্নাতের আকাঙ্খা প্রকাশ কর। অথচ জান্নাতের জন্য তোমাদের কোন ব্যাকুলতা নেই।

৮। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোমরা মানুষের গীবত ও দোষ-চর্চা শুরু কর অথচ নিজেদের দোষ সম্পর্কে থাকো সম্পূর্ণ উদাসীন।

এরপর ও তোমাদের দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভের যোগ্যই বা হতে পারো কিভাবে?

—এহয়াউল উলুম।

নেক আমল মুছে যাওয়া :

গীবতের দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, তা মানুষের নেক আমল মুছে দেয়।

কেয়ামতের দিন প্রতিটি ব্যক্তি তার "নামা-আমল" (পৃথিবীর ভালোমন্দ সকল কাজের নিখুঁত হিসাব-পত্র) দেখতে পাবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে একদল বলবে

: পরওয়ারদিগার! এত ভালো আমল ত আমি করিনি। আমার "নামা-আমলে" এগুলি জমা হলো কিভাবে?

উত্তর আসবে : দুনিয়াতে যারা তোমার দোষ চর্চা করেছে তাদের নেক আমলগুলিও তোমার "নামা-আমলে" যোগ হয়েছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আরেক দল বলবে : পরওয়ারদিগার! আমাদের আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাচ্ছি না যা দুনিয়াতে আমরা করেছিলাম। এর কারণ কি?

১. নেক আমল নষ্ট হওয়া:

গীবত করলে মানুষের নেক আমল বা পুণ্য কাজগুলো মুছে যায়। যেমনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"দুনিয়াতে নেক আমলের পাশাপাশি তোমরা মানুষের দোষ চর্চাও করেছ। এই গীবত তোমাদের নেক আমলগুলি মুছে দিয়েছে।"

(সূত্র: তারগীব ওয়াত্তারহীব, তামবীহুল গাফেলীন)

২. হযরত হাছান বছরী (রহ.)-এর উদারতা:

একবার এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে হযরত হাছান বছরী (রহ.)-এর গীবত করছিল। তা জানতে পেরে তিনি ঐ ব্যক্তিকে মূল্যবান উপহার পাঠান এবং একটি পত্রে লেখেন: "ভাই! তোমার চেয়ে উপকারী বন্ধু এ দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই। কেননা স্বেচ্ছায় তুমি তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিচ্ছ। তোমার এই উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সামান্য কিছু উপহার পাঠালাম। আশা করি গ্রহণ করবে।"

(সূত্র: নুযহাতুল মাজালিস)

৩. প্রকৃত দরিদ্র কে?

নবী করীম (সা.) সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকৃত দরিদ্র ও নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, যার টাকা-পয়সা নেই সেই দরিদ্র। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অনেক নেক আমল নিয়ে হাজির হবে।

কিন্তু একদল লোক আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

কারো অর্থ সে আত্মসাৎ করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত ও দোষ চর্চা করেছে। কিংবা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষী দিয়েছে ইত্যাদি।

ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের দণ্ড হাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরশে সমাসীন। তিনি সকলের মধ্যে তার নেক আমল বণ্টন করা শুরু করবেন। নেক আমল শেষ হয়ে যাবে।

অথচ অভিযোগকারীদের দীর্ঘ তালিকা তখনও বাকি। আল্লাহ পাক তখন সকলের গুনাহ ও বদ আমলের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবেন। সকলে তার নেক আমল নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। আর সে সকলের বদ আমলের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ফিরিশতাগণ তাকে টেনে নিয়ে যাবে জাহান্নামের দিকে। সেই হলো সত্যিকার দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি। কেননা দুনিয়াতে কেউ বিপদে পড়লে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছুটে আসে সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেয়ামতের কঠিন দিনে কেউ এগিয়ে আসবে না কারো সাহায্যের জন্য। পিতা-মাতা সন্তানকে দেখে আর সন্তান পিতা-মাতাকে দেখে পালিয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে এড়িয়ে যাবে। প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। শুধু ইয়া নফসী।

— মাআলিমুত্তানযীল।

নেক আমল কবুল না হওয়া :

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। গীবত থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এতে তিনটি মহা ক্ষতি রয়েছেঃ

- ❖ প্রথমত : গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না।
- ❖ দ্বিতীয়ত : তার নেক আমল গ্রহণ হয় না।
- ❖ তৃতীয়ত : তার আমলনামায় বদ আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

— খাজানাতুর রিয়াযাত।

অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ শুকনো জিনিসের জন্য আগুন যেমন, নেক আমলের জন্য গীবত ও তেমনি ক্ষতিকর।

অর্থাৎ আগুন যেমন এক মুহূর্তে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় তদ্রূপ গীবত ও মানুষের সমস্ত নেক আমল বরবাদ করে দেয় এক মুহূর্তে।

— এহয়াউল উলুম।

হযরত মুআজ্জ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করা হলো একটি হাদীস বলার জন্য।

হযরত মুআজ্জ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। পরে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। হাদীসটির একাংশ এই—

একবার রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেনঃ

হে মুআজ্জ! কখনো এমন হয় যে, এক ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন নেক আমল করে। যমিনের ফিরিশতাগণ সে আমল নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছে। কিন্তু সেখান থেকে আর সামনে যাওয়ার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হয়না। বরং এই নির্দেশ দেয়া হয়ঃ

সমস্ত আমল ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এবং ঐ ব্যক্তিকে কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। কেননা সে মুসলমানদের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত রয়েছে, অতএব তওবা করার পূর্ব পর্যন্ত তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না।

— ফকীহ আবুল্লায়ছ।

হিসাব কঠিন হওয়াঃ

হযরত আলী কার্যামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেনঃ

হাশরের মাঠে হিসাব কিতাবের বারটি মঞ্জিল হবে। প্রতিটি মঞ্জিলে একটি করে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে কারো গীবত করে থাকে...

তবে সেখানেই তাকে হাজার বছর দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আর অন্যরা নির্বিঘ্নে তার পাশ কেটে চলে যাবে জান্নাতে।

—কিতাবুল গাম্যাহ।

হযরত দাউদ তাঈ একবার কোন এক পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন :

পরে লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন :

এখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার মনে হলো যে, এখানে একদিন আমি এক ব্যক্তির গীবত করেছিলাম। তাই আমার এ অবস্থা হলো।

হাশরের মাঠে গোশত খাওয়া :

হযরত আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন :

যে ব্যক্তি মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত থাকবে, কেয়ামতের দিন তার সামনে গীবতকৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত করে বলা হবে :

যেহেতু দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তির গোশত খেয়েছো সেহেতু আজ মৃতাবস্থায়ও তোমাকে এর গোশত খেতে হবে।

তখন বাধ্য হয়ে সে নিজের দাঁতে কামড়ে সেই গোশত খাবে এবং ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ফেলবে।

—তাবরানী।

ছাহাবা কেরামদের কাছে পবিত্র মেরাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :

আমি এমন কিছু লোক দেখলাম যাদের শরীর থেকে গোশত কেটে কেটে তাদের মুখে পুরে দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে :

দুনিয়াতে তোমরা অন্য মানুষের গোশত খেয়েছো এখন নিজেদের গোশত খাও।

আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম :

ভাই জিব্রাঈল ! এরা কারা? এবং এদের এরূপ কঠিন আযাব হচ্ছে কেন?

তিনি আমাকে জানালেন :

এরা দুনিয়াতে মানুষের দোষ চর্চা করে বেড়িয়েছে ! তাই আজ এদেরকে এরূপ কঠিন আযাবে নিপতিত করা হয়েছে।

কবরের আযাব

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন :
কবরের তিন ভাগের এক ভাগ আযাব হয় গীবতের শাস্তি স্বরূপ।

আস্থাহীনতা :

দুনিয়াতে গীবতের একটা বড় কুফল হচ্ছে এই যে, গীবতকারী সকলের আস্থা হারায়। কেউ তার উপর আস্থা স্থাপন করতে ভরসা পায়না। কেননা সকলেই একথা মনে করে যে, আজ যেমন সে আমাদের সামনে অন্য মানুষের দোষ আলোচনা করছে তেমনি কাল যে সে অন্যের সামনে আমাদের দোষ আলোচনা করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

বিশ্ব-বিখ্যাত চরিত্র বিশারদ শেখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় সুন্দরভাবে বলেছেন :

যে ব্যক্তি তোমার সামনে অন্যের নিন্দা করছে তার কাছে এ আশা তুমি করোনা যে, অন্যের কাছে সে তোমার সুখ্যাতি পাইবে। কেননা দোষ চর্চা করাটাই হচ্ছে তার মজ্জাগত পেশা।

শেখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অমর কবিতা মালায় আরো লিখেছেনঃ

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে এক মূর্খ মানুষের গীবত ও দোষ চর্চা শুরু করলো।

জ্ঞানী ব্যক্তিটি তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বললেনঃ

দেখো ভাই! মানুষের গীবত করে তুমি তোমার প্রতি আমার আস্থা নষ্ট করে দিওনা।'

গীবত শয়তানকে আনন্দ দেয়ঃ

মাটির সৃষ্টি আদমকে সেজদা না করার অপরাধে যেদিন শয়তানকে আল্লাহর অসংখ্য, অকল্পনীয় নেয়ামত পরিবেষ্টিত জান্নাতের মনোরম উদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হতে হলো সেদিন থেকেই মানুষকে সে তার একমাত্র ও চিরশত্রু বলে চিহ্নিত করে নিয়েছে। এবং সেদিন থেকেই সে তার সকল শক্তি নিয়োজিত করেছে মানুষকে গোমরাহ করার কাজে। জান্নাতের অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামের চির কঠিন আযাবে নিক্ষেপু করার পিছনে।

আল্লাহ পাকও মানুষকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন!

এরশাদ হয়েছেঃ

"শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব তাকে তোমরা শত্রুই মনে করো"!

শয়তান যখন মানুষকে কোন নেক আমল করতে দেখে তখন দুঃখে, হতাশায় সে মুসড়ে পড়ে। নিজের চুল নিজেই টেনে ছিঁড়তে শুরু করে। আর যখন তাকে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে দেখে তখন তার আনন্দের কোন শেষ থাকে না। খুশিতে আত্মহারা হয়ে সে তখন বলতে থাকেঃ

আদমের বেটা এবার আমার ফাঁদে পা দিয়েছে। বিভিন্ন কলা কৌশলে শয়তান তখন তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহ যোগায়।

পাপ কাজ মাত্রই শয়তানকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শয়তান নিজেই একথা স্বীকার করেছে যে, গীবতই তাকে সব থেকে বেশী আনন্দিত করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ছালাম একবার শয়তানের সাক্ষাত পেলেন। দেখেন— একহাতে মাটি আর অন্য হাতে কিছু মধু নিয়ে আপন মনে শয়তান হেঁটে যাচ্ছে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ছালাম শয়তানের পথরোধ করে দাঁড়ালেন এবং এই মাটি ও মধুর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

শয়তান কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো। পরে বললোঃ

হুজুর! আদম সন্তানের দুটি কাজ আমাকে যার পর নাই আনন্দিত করে। তাই আমি তাদেরকে সে দুটি পাপ কাজে সাধ্যমত উৎসাহ যোগাতে চেষ্টা করে থাকি।

হুজুর! সত্য কথা বলতে কি মাঝে মাঝে আদম সন্তানের নির্বুদ্ধিতা দেখে আমিও হতবাক হয়ে যাই। আল্লাহ পাক মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অথচ মানুষ অবলীলাক্রমে আমার ফাঁদে পা দিয়ে বসে থাকে। এবং সে দুটি কাজই করে সবচেয়ে বেশী যা আমাকে সর্বাধিক আনন্দ দেয়।

হুজুর! সে দুটি কাজ হচ্ছে—এতিমের প্রতি নির্দয় ব্যবহার এবং মানুষের গীবত ও দোষচর্চা।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ছালাম বললেনঃ

সে-ত বুঝলাম। কিন্তু মাটি ও মধু দিয়ে তোমার কোন কাজটা হাসিল হয় শুনি!

শয়তান আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললো :

এই মাটি আমি এতিম ছেলের মুখে ও মাথায় ঢেলে দেই যেন কেউ তাদের প্রতি কোন রূপ মমতা বোধ না করে। আর এই মধু ঢেলে দেই গীবতকারীর মুখে, যেন তার কথা আরো শ্রুতিমধুর হয়।

হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম বললেন : রাখো। তোমার সব শয়তানির কথা আমি মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিবো।

শয়তান পূর্বের মতই হেসে বললো :

কিন্তু হুজুর! তাতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

— নুযহাতুল মাজালিস।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করার কারণে শয়তানের উপর অনবরত অভিশাপ ও লানত বর্ষিত হচ্ছে! অভিশপ্ত শয়তানকে যে খুশি করবে তার উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাজত করুন।

রোজার ছওয়াব নষ্ট হওয়া :

ওলামা কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, রোজা অবস্থায় গীবত করলে সে রোজা মাকরূহ হয়ে যায়। হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, গীবতের কারণে রোজা ভেঙ্গে যায়। হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এ মত পোষণ করেন।

দলিল হিসাবে তাঁরা নীচের হাদীসটি পেশ করেন।

দুজন ছাহাবী একবার নফল রোজা রাখলেন। আছর পর্যন্ত তাঁরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিলেন। আছরের পর তিনি তাদেরকে ডেকে বলে দিলেন :

তোমরা তোমাদের আজকের এ রোজার কাযা করে নিও।

অবাক হয়ে তাঁরা প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন? আমাদের রোজা কি শুদ্ধ হয়নি?

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন :

না। তোমাদের রোজা হয়নি। কেননা রোজা রাখা অবস্থায় তোমরা গীবত করেছো।

—মিশকাত, বাবুল গীবত

একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন : আজ আমার অনুমতি না নিয়ে কেউ ইফতার করো না।

ইফতারের সময় আসন্ন। ছাহাবাগণ দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে একে সকলকেই অনুমতি দান করলেন।

শেষে এক ছাহাবী এসে আরয করলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুই মেয়ে আজ রোজা রেখেছে। কিন্তু তারা খুবই লজ্জাশীলা। তাই মসজিদে উপস্থিত হতে খুবই সংকোচ বোধ করছে। এবং ইফতার করার অনুমতি লাভের জন্য আমাকে আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

উক্ত ছাহাবী দ্বিতীয় বার একই আরয করলেন।

আল্লাহর রসূল এবারও তার কথার কোন উত্তর দিলেন না।

তৃতীয় বারের পর তিনি উক্ত ছাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন :তাদের আজকের এ রোজা শুদ্ধ হয়নি। কেননা ঘরে বসে বসে সারা দিন ওরা আজ মানুষের গোশত খেয়েছে। ওদেরকে আমার কাছে আসতে বলো।

লজ্জাবনত অবস্থায় মেয়ে দুটি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলো।

তিনি তাদের সামনে একটি পেয়ালা রেখে বমি করার নির্দেশ দিলেন। দেখা গেলো— উভয়ের মুখ থেকে পুঁজ মিশ্রিত রক্ত বেরুচ্ছে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

সারাদিন বাড়ীতে বসে এরা মানুষের গোশত খেয়েছে। এ রক্ত তারই আলামত।

—এহয়াউল উলূম।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, চারটি পাপ এমন যার কারণে অজু নষ্ট হয়ে যায়। নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং রোজা ভেঙ্গে যায়।

প্রথমতঃ গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ চোগলখোরী করা। তৃতীয়তঃ মিথ্যা কথা বলা। চতুর্থতঃ পরনারীর দিকে গর্হিত দৃষ্টিতে তাকানো। এই চারটি জিনিস অপরাধের শিকড়কে সজীব করে যেমন পানি সজীব করে গাছের শিকড়কে।

—তামবীহুল গাফিলীন।

বিদ্বেষ ও বিভেদঃ

দুনিয়াতে গীবতের সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে এই যে, এর ফলে মুসলমানদের একতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিলুপ্ত হয়। ফলে দুনিয়াতেই সকলে জাহান্নামের অশান্তি ভোগ করে।

আজ সমাজের প্রতি ঘরে ঘরে হিংসা-বিদ্বেষ, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশান্তির আগুন যে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার পেছনেও মূলতঃ সক্রিয় রয়েছে গীবতের গর্হিত ও কদর্য স্বভাব।

এটা স্বীকৃত সত্য যে, দোষ চর্চার মাধ্যমে শুধু হিংসা, বিদ্বেষ ও ভাঙ্গনই সৃষ্টি হয়, আর আন্তরিক প্রশংসা ও হিতাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রেম প্রীতির মজবুত বন্ধন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গীবতের কারণ ও প্রতিকার

কি কি কারণে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়।
গীবত থেকে বাঁচার উপায় কি?
এখানে আমরা সংক্ষেপে তা আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

ক্রোধ :

ক্রোধ হচ্ছে গীবতের একটি প্রধান কারণ। মানুষ যখন কোন কারণে কারো উপর ক্রুদ্ধ হয় তখনই শুরু হয় গীবতের পালা। তখনই সে মেতে উঠে কুৎসা রটনার নারকীয় উল্লাসে।
একজন এসে হয়তো আমাকে বললো : খালেদ আপনার সম্পর্কে এই বলেছে।
স্বভাবতই তখন খালেদের বিরুদ্ধে আমার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হবে। শয়তানও এ সুযোগটি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইবে না। কেননা দুই মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করাই হলো শয়তানের আসল কাজ। বিভিন্ন কৌশলে সে তখন আমাকে লেলিয়ে দিবে খালেদের বিরুদ্ধে।
আমি মেতে উঠবো তার দোষ চর্চায়। কেননা আমাকে তখন ক্রোধ চরিতার্থ করার নেশায় পেয়ে বসবে। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার কথা আমার অন্তরে ভুলেও উদয় হবে না একবার।
কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমি আমার ক্রোধ সম্বরণ করতে সক্ষম হই তবে গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হবো।
বিষয়টিকে আমি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবেও দেখতে পারি যে, মাধ্যম ব্যক্তিটি যে সত্য কথাই বলেছে এর তো কোন প্রমাণ নেই। অতএব তার কথা আমি বিশ্বাস করতে যাবো কেন?

ফকীহ আবুল্লায়ছ চমৎকার বলেন:

কেউ যখন তোমার কাছে এসে এ ধরণের কোন কথা বলে তখন তোমার কয়েকটা কাজ করা উচিত।

এই শোনা কথা অন্যের কাছে নকল করো না।

যার সম্পর্কে এ ধরণের কথা বলেছে তুমি তার দোষ খুঁজতে শুরু করেন। কেননা মানুষের দোষ খোঁজা ভালো নয়।

তার উপর বদগোমানী করো না। কেননা সত্যাসত্য যাচাই না করে বদগোমানী করা মহাপাপ।

উক্ত চোগলখোর সম্পর্কে সতর্ক থেকো।

তাকে এই বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিও।

এর পর যদি প্রয়োজন মনে কর তবে আসল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও, ব্যাপারটা কতদূর সত্য। অবশ্য সে ক্ষেত্রে কারো নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। কেননা এতে উভয়ের মধ্যে মনমালিন্য সৃষ্টি হবে।

একবার খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের মজলিসে ইমাম জোহরী উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর দরবারে একজন লোক উপস্থিত হলো।

তাকে দেখা মাত্রই সোলায়মান বলে উঠলেনঃ আমি শুনেছি তুমি আমার দোষ গেয়ে বেড়াচ্ছো।

লোকটি খলিফার অভিযোগ অস্বীকার করলো!

ইমাম জোহরী সব শুনছিলেন। তিনি খলিফাকে লক্ষ্য করে বললেন।

তোমার কাছে এ ধরণের কথা যে পৌঁছিয়েছে সে চোগলখোর। এ ধরণের লোক কখনও বিশ্বস্ত হতে পারে না।

একথাও আমাকে চিন্তা করতে হবে যে, সত্যি সত্যি যদি সে আমার গীবত করে থাকে তবে সে নিজেই নিজের পাপের বোঝা বৃদ্ধি করছে। এবং আমাকে তার পুণ্য দিয়ে দিচ্ছে। এখন আমি কেন পাল্টা তার গীবত করে পাপের বোঝা বৃদ্ধি করবো এবং অন্যকে নিজের পুণ্যের ভাগ দিতে যাবো।

হযরত হাছান বছরী তার কুৎসা রটনাকারীর জন্য এই বলে উপহার পাঠিয়েছিলেনঃ ভাই? শুনেছি তুমি স্বেচ্ছায় নিজের পুণ্য আমাকে দিয়ে দিচ্ছ। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ উপহার পাঠালাম।

কেউ সামনাসামনি দুর্ব্যবহার করলে অথবা কটু ভাষা প্রয়োগ করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে ক্রোধের সঞ্চার হবে। এবং গীবত শুরু হয়ে যাবে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উপদেশ বাণী স্মরণ করতে হবেঃ

কুস্তি লড়ে যে সকলকে পরাস্ত করে সে ধীর বা সাহসী নয়। প্রচণ্ড ক্রোধের সময় নিজেকে যে সংযত রাখতে পারে, পারে নফসকে দমিয়ে রাখতে, সেই হচ্ছে প্রকৃত বীর।

আমার পেয়ারা নবী কত সুন্দর করে উপদেশ দিয়েছেন। এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীকালের মহাপুরুষগণ কত বিশ্বস্তভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সে উপদেশ বাণী।

এক যুদ্ধে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু শত্রু সৈনিকের বুকে চেপে বসলেন। পরাস্ত শত্রু সৈনিক উপায়ান্তর না দেখে তাঁর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত অসি নামিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় হত বিহবল শত্রুর মুখে প্রশ্ন :

আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কেন?

শুনুন উত্তর এবং বিশ্বাস করুন। সত্যি সত্যি এ ঘটনা ইতিহাসের পাতায় এক দিন ঘটেছিলো। প্রশান্ত মুখে হযরত আলী উত্তর দিলেন :

ভাই! তোমার বিরুদ্ধে এতক্ষণ যে আমি অস্ত্রধারণ করেছিলাম তা ছিলো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য। কিন্তু তুমি আমার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়ার কারণে আমার অন্তরে তোমার প্রতি এখন ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। ক্রোধের বশীভূত হয়ে যদি তোমাকে হত্যা করি তবে আল্লাহ পাকের কাছে আমি কি জবাব দিব?

আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে রক্ত পিপাসু কাফের ছুটে এসেছিল যুদ্ধের মাঠে, সে-ই তখন হযরত আলীর বুকে ঝাঁপিয়ে

পড়ে অশ্রুসজল চোখে বলছে :যে ধর্ম মানুষকে যুদ্ধের মাঠেও এত বড় মহত্বের শিক্ষা দেয়, সে ধর্মই আমার ধর্ম। মহানবী সত্যই বলেছেনঃ

প্রচণ্ড ক্রোধের মুখে নিজেকে যে সংযত রাখতে পারে সেই হচ্ছে প্রকৃত বীর।

আপন ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে এক বুজুর্গ মজলিসে বসা আছেন। সেই সময় মজলিসে হাজির হলো এক লম্পট ব্যক্তি। উক্ত বুজুর্গকে নাজেহাল করার মতলবে প্রকাশ্য মজলিসে সে বললঃ

শুনেছি, আপনি নাকি জারজ সন্তান?

বজ্রাহতের মত গোটা মজলিস নিশ্চুপ। শান্ত স্মিত মুখে তিনি উত্তর দিলেনঃ

না ভাই! কথাটা ঠিক নয়। আমার মা-বাবার বিয়েতে যারা সাক্ষী হয়েছিলেন তারা এখনও জীবিত আছেন। তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই তুমি জানতে পাবে।

অপর এক বুজুর্গকে প্রশ্ন করা হলোঃ

আপনি উত্তম, না পথের ঐ কুকুরটি আপনার চেয়ে উত্তম?

বুজুর্গ উত্তর দিলেনঃ

ভাই! যদি ইমানের সাথে মরতে পারি তবে আমিই উত্তম। আর আল্লাহ না করুন যদি মৃত্যুর সময় ইমান নছীব না হয় তবে কুকুরটিই আমার চেয়ে উত্তম।

এ ধরনের আরও অসংখ্য নজীর পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু মনে হয় তার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে এজন্য দীর্ঘ মুজাহাদা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। একদিনেই সেটা হবার নয়।

আমার ভাই! তুমিও আজ থেকে এ মুজাহাদা শুরু করে দাও। অবশ্যই তুমি আল্লাহ পাকের মদদ লাভে সক্ষম হবে।

চাকর, কর্মচারী তথা অধিনস্তদের কেউ কথা না শুনলে নির্দেশিত কাজটি সুচারুরূপে করতে ব্যর্থ হলে, কথার অবাধ্য হলে কিংবা কাজে গড়িমসি করলে স্বভাবতই মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়।

প্রায়ই দেখা যায় মানুষ চাকর-বাকর ও অধিনস্তদের অনুপস্থিতিতে তাদের গীবত শুরু করে। এমনকি অনেক মার ধোরসহ বিভিন্ন রকম দুর্ব্যবহারও করে থাকে।

সে মুহূর্তে আমাদেরকে এরূপ চিন্তা করতে হবে যে, আমার অধীনস্তদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আমি সহ্য করতে পারছি না। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যাই। অথচ আমি তাদের স্রষ্টা নই, রব নই। রিজিকদাতাও নই। বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়ই ওরা সেবক ও আমি সেবিত হয়েছি।

পক্ষান্তরে যিনি আমাদের সকলের স্রষ্টা, সকলের প্রতিপালক ও রিজিকদাতা, প্রতি নিয়ত ডুবে আছি যার অসংখ্য নিয়ামতে, তাঁর অসংখ্য হুকুম আমি ভঙ্গ করছি অহরহ। হাজারো নিয়ামত ভোগ করেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত আমার অন্তরে উদয় হয় না কখনও। তাই বলে কি তাঁর দান ও দয়া, রহমত ও করুণা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়েছে?

কেয়ামতের দিন আমাদের সকল পাপাচার ও অনাচারের যদি হিসাব নেয়া হয় তখন সেই মহা পরাক্রমশালীর ক্রোধের সামনে আমাদের কি অবস্থা হবে তা কি একবার ভেবে দেখা উচিত নয়?

আজ যদি আমরা আমাদের অধিনস্তদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করতে পারি তবে সেই উছিলায় কেয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে হয়তো আল্লাহ পাকও আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :

আমি দশ বছর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করেছি। যদি কখনও আমি এমন কোন কাজ করে ফেলেছি যা তার মনপূতঃ নয় তখন তিনি সামান্য ক্ষোভও প্রকাশ করেননি। অথবা জিজ্ঞাসা করেননি এটা আমি কেন করেছি।

তদ্রূপ কোন জরুরী কাজ করতে ভুলে গেলে তিনি কৈফিয়ত চাননি যে, এটা কেন করা হয়নি।

--আবু দাউদ।

হযরত মায়মুনের দাসী একবার পেয়ালা ভরে তরকারী আনছিলো। অসতর্কতাবশতঃ তা পড়ে গেলো হযরত মায়মুনের গায়ে। কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হয়ে গেলো।

ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দাসীকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন।

দাসী সাথে সাথে আরয করল :

আল্লাহ ক্রোধ সংবরণকারীকে ভালোবাসেন। কোরআন শরীফে এমন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে।

হযরত মায়মুন সাথে সাথে ক্রোধ সংবরণ করলেন।

দাসী বললো : আল্লাহ ক্ষমাকারীকে পছন্দ করেন। আপনার কি তাঁর পছন্দনীয় হতে ইচ্ছা হয় না?

মায়মুন বিহবল হয়ে বললেন। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

দাসী আবার বললো : আল্লাহ সদয় ব্যবহারকারীকে ভালোবাসেন। আমি আপনার সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করি।

হযরত মায়মুন দাসীর চমৎকার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উৎফুল্ল চিত্তে তিনি বললেন :

যাও তুমি মুক্ত। আযাদ।

---তাম্বীহুল গাফিলীন।

গর্ব ও অহংকার :

গীবতের আরেকটি বড় উৎস হচ্ছে গর্ব ও অহংকার। অহঙ্কারের ফলেই মানুষ নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট ভাবতে শুরু করে। নিজের সব কিছুকেই মনে হয় গুণ আর অন্যের সবকিছুকে মনে হয় দোষ—সে দোষের সত্য-মিথ্যা আলোচনায় মানুষ তখন একরকম পাশবিক পুলক অনুভব করে।

অহঙ্কারের জন্ম হয় বংশ গরিমা থেকে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে, রূপ ও সৌন্দর্য থেকে কিংবা মেধা ও বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এসব নিয়ে অহঙ্কারের মাধ্যমে নিজেকে নিজেই আমরা বোকা ও নির্বোধ প্রমাণ করছি।

মানুষ মাত্রই আদমের সন্তান। মানুষকে আল্লাহ বিভিন্ন গোত্র ও খান্দানের শ্রেণীবদ্ধ করেছেন—অহঙ্কার ও গর্ব করার জন্য নয়। কারো বংশ গরিমা ও খান্দানী পরিচয় কোন কাজেই আসবে না আল্লাহ পাকের কাছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :

আরবের উপর অনারবের এবং অনারবের উপর আরবের, সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাকওয়া (পবিত্রতা ও খোদাভীতি) ই হলো শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড।

শ্রেষ্ঠ বংশ কোরেশের সন্তান হয়েও আবু জাহেল অভিশপ্ত হলো। আর হাবসী দাস বেলাল হলেন রসূলের মুয়াজ্জিন। হযরত ওমর যাকে সমীহ করে বলতেন : আমাদের ছাইয়েদ-সরদার।

বংশ ও খান্দানের এ বিভক্তি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। কেননা আদমের সন্তান হিসাবে সকলেই আমরা ভাই ভাই। তোমার গায়ের বর্ণ শ্বেত, আমার গায়ের বর্ণ কৃষ্ণ। কিন্তু তোমাতে আমাতে তফাৎ কোথায়? আমরা উভয়েই আদমের সন্তান। আমি যেমন পেটে পায়খানা বহন করে ফিরছি, তুমিও তাই। আমি মুচির ছেলে আর তুমি রাজার ছেলে। তুমি আশরাফ, আমি আতরাফ। কিন্তু যখন মরবো তখন উভয়েই মাটির নিচে যাবো। উভয়ের শরীর-ই পঁচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। অতএব হে মাটির তৈরী আদম সন্তান! গর্ব কিসের?

মুহাল্লাব ছিলো খুব অহংকারী ব্যক্তি! যেমন ছিলো তার অর্থ তেমনি ছিলো সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর তেমনি ছিলো দৈহিক সৌন্দর্য।এই মুহাল্লাব একদিন দামী দামী কাপড়-চোপড় গায়ে জড়িয়ে আতর খুশবো মেখে দলবল নিয়ে বেশ অহংকারী চালে হেঁটে যাচ্ছিলো।

অবাক পথচারী পথ চলা বন্ধ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলো। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলোঃ ঐ দেখ; মুহাল্লাব যাচ্ছে।

এক আল্লাহর অলী এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে মুহাল্লাবকে কোমল স্বরে উপদেশ দিয়ে বললেনঃ

হে আল্লাহর বান্দা! অহংকার আল্লাহর পছন্দ নয়।

মুহাল্লাব ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ তখন তার যেন দুটি রক্ত জবা। ঠোঁটে ঠোঁটে কামড়ে বললোঃ

বটে! আমাকে উপদেশ খয়রাত করা হচ্ছে। বেটা জানিস কে আমি?

স্মিত হেসে আল্লাহর ওলী জবাব দিলেন :

খুব জানি। এক সময় আমার মতই তুমি এক ফোঁটা নাপাক পানি ছিলে। মায়ের পেটে নাপাক রক্ত খেয়ে দুনিয়াতে এসেছো। তখন তোমার এ অহংকার ছিল না। মৃত্যুর পর তুমি কবরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। পচে গলে তোমার এই সুন্দর কমনীয় দেহ মিশে যাবে মাটির সাথে। মাঝখানে দুনিয়াতে তুমি নাপাক দুর্গন্ধ বহন করে ফিরছো।

এই ত তোমার পরিচয়। এর পরও অহংকার তোমার জন্য কি করে শোভনীয় হতে পারে?

মুহাল্লাবের অন্তরে আল্লাহর ওলীর হৃদয়-নিড়ানো এ উপদেশ বাক্য বিরাট ঝড় তুললো। আল্লাহর ভয় তাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, সেখানে সেই মুহূর্তে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

সেদিন থেকে মুহাল্লাবের যেন নতুন করে জন্ম হলো। মৃত্যু পর্যন্ত মাথা উঠিয়ে চলতে দেখেনি তাকে কেউ।

—তাম্বীহুল গাফিলীন।

নিজের রূপসৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করার এবং অন্যের শারীরিক আকৃতি সম্পর্কে কটাক্ষ করার কি অধিকার আছে আমার সকল আকৃতি আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি। কাউকে তিনি দৈহিক সৌন্দর্য দিয়েছেন। কাউকে দেননি। কারো চামড়ার বর্ণ করেছেন সাদা। কারোটা কালো। কেন করেছেন তার হিকমত শুধু তিনিই জানেন। আমি কি একবারও ভেবে দেখেছি—মানুষের আকৃতি সম্পর্কে কটাক্ষ করে মানুষকে অপমান করার ছলে মূলত : আমি কাকে অপমান করছি? কার সৃষ্টি কুশলতায় খুঁত ধরছি?

যার বড় বড় দাঁত, বা চ্যাপ্টা নাক দেখে আমি কৌতুক বোধ করছি, আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে তারও আমার ব্যবধান কত বিরাট, তা-কি আমি ভেবে দেখেছি?

রাতের পর রাত নিদ্রার সুখ কোরবানি করে ঐ কুশ্রী চোখ দুটো আল্লাহর দরবারে যে অশ্রু সঞ্চয় করে রেখেছে তার তুলনায় আমার এই নিদ্রালস সুন্দর চোখ দুটি কি মর্যাদা দাবী করতে পারে?

ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

মদিনা মুনাওয়ারায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ ছালাতে ইসতিসকা (বৃষ্টির নামাজ) পড়ার জন্য জমায়েত হলো। হযরত ইবনুল মুবারকও সে জামাতে উপস্থিত ছিলেন। অনবরত কয়েক দিন নামাজ পড়া হলো। কিন্তু আকাশের গায়ে এক খণ্ড মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

শেষ দিন ইবনুল মুবারক দেখলেন—এক কুৎসিত হাবসী গোলাম, গায়ে তার শুধু একটা চাদর। আকাশের পানে দুহাত তুলে আবেগময় ভাষায় মোনাজাত করছে। "পরওয়ারদিগার! আমরা গুনাহগার অপরাধী। আমাদের গুনাহের কারণেই তুমি পানি বন্ধ করে দিয়েছো। মাবুদ! অনুতপ্ত অন্তরে আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। তুমি তোমার রহমতের পানি নাজিল কর মাবুদ! তোমার পিপাসা কাতর বান্দাদের ওপর পানি নাজিল কর মাবুদ! তোমার পিপাসা কাতর বান্দাদের উপর করুণা করো মাবুদ।"

হাবসী গোলাম তার মোনাজাতের শেষ শব্দ কটি তখনও শেষ করেনি। মুহূর্তে সারা আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। মুষলধারা বৃষ্টি শুরু হলো।

ইবাদতও অনেক সময় অহংকারের জন্ম দেয়। তখন একথা মনে রাখা উচিত যে, শেষ মুহূর্তে ইমান নিয়ে যেতে পারাই হচ্ছে আসল। কেননা এমনও দেখা যায় যে, সারা জীবন ইবাদত বন্দেগী করার পরও...

কেন একটি বদ আমলের কারণে মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে যাওয়ার তাওফিক হয় না।

আবার এমনও দেখা যায় যে, সারা জীবন গোমরাহীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন একটি ক্ষুদ্র আমলের ওসিলায়—যা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়েছে—মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তওবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ঈমানের সাথে হয়েছে মৃত্যু নসীব।

অতএব নিজের ইবাদত বন্দেগী তথা পরহেজগারীর উপর গর্ব করা কিছুতেই উচিত নয়। এবং কোন মানুষকেই বদ আমলের কারণে ঘৃণা করা উচিত নয়। আল্লাহ অহংকার এত অপছন্দ করেন যে, তিনি অহংকারীর সারা জীবনের সমস্ত ইবাদত বন্দেগীই ঘৃণা ভরে ফিরিয়ে দেন। তদ্রূপ বিনয় ও নম্রতা তাঁর কাছে এত প্রিয় যে, সারা জীবনের সমস্ত নাফরমানী তিনি এক মুহূর্তের বিনয়ের দৌলতে ক্ষমা করে দেন।

হাদীস শরীফে বনী ইসরাইলের দুজন মহিলার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছেঃ

প্রথমোক্ত মহিলাটি ছিল ইবাদত গুজার! কিন্তু সে সব সময় একটি বিড়াল বেঁধে রাখতো। অথচ তাকে কিছু খেতে দিতো না। তার এই নির্দয় আচরণ আল্লাহর খুব অপছন্দ হলো। ফলে সারা জীবনের ইবাদত সত্ত্বেও সে জাহান্নামী হলো।

দ্বিতীয় মহিলাটি ছিল বদ চরিত্রের। একদিন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দেখলো—পিপাসার্ত এক কুকুর এক কুয়ার পাড়ে হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় তার জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে। মহিলাটি ছিল কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী। কুকুরটির এ অবস্থা দেখে তার খুব দয়া হলো। অনেক কষ্টে সে কুয়া থেকে সামান্য পরিমাণ পানি উঠিয়ে এনে কুকুরকে পান করালো। এভাবে পিপাসা কাতর কুকুরটি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলো। আল্লাহ পাকের কাছে এ আমলটি বড়ই পছন্দনীয় হলো। মহিলাটির সমস্ত পাপ মাফ হয়ে গেলো। সে জান্নাতী হলো।

এক ফাসেক ও দুষ্কৃতকারীর মৃত্যু হলো। যেহেতু জীবিতাবস্থায় মানুষকে সে শুধু জ্বালিয়েছে। অপকার ছাড়া কারো উপকার করেনি কোন দিন! তাই তার মৃত্যুতে

সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কেউ জানাযায় শরীক হলো না। কিন্তু সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং নিজেই জানাযার নামাজ পড়ালেন। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ এমন ফাসেক ও দুষ্কৃতকারীর জানাযা আপনি কি করে পড়ালেন? যা কাজই ছিলো শুধু মানুষকে কষ্ট দেয়া?

আল্লাহর অলী বললেনঃ এলহাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ নির্দেশ দানের এক প্রক্রিয়া) যোগে জানতে পেরেছি যে, এর সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাই আমি এর জানাযা পড়লাম।

সকলের বিস্ময় তখন আরো চরমে পৌঁছালো। সকলেই জানতে উৎসুক হলো, এমন কি আমল সে করেছে যার ফলে এত বড় বড় অপরাধ তার মাফ হয়ে গেল।

মৃত ব্যক্তির বিধবাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানালেন, আমার স্বামী সারা রাত মদের নেশায় বিভোর হয়ে থাকতে ন, কিন্তু সুস্থ হয়েই খুব কাঁদতেন আর বলতেনঃ

খোদা! জানি না জাহান্নামের কোন অতলে আমার স্থান হবে আরো একটি ভালো কাজ তিনি করতেন। সব সময় দু'চার জন এতিমকে...গুনাাহের ব্যয় ভার বহন করতেন এবং তাদের সাথে খুবই সদয় আচরণ করতেন।

সব কথা শুনে আল্লাহর অলী বললেনঃ রহমানুর রহীমের মাগফেরাত লাভের জন্য এ দুটো আমলই যথেষ্ট।

--- এহ্ইয়াউল উলুম।

মোটা কথা পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে নয় এবং পাপের সমালোচনা করা উচিত কিন্তু পাপীকে হেয় অপদস্ত করার জন্য তার দোষ আলোচনা করা উচিত নয়। মানুষের অন্তর আল্লাহর হাতে। যেকোন মুহূর্তেই তিনি হৃদয়ের মোড় পরিবর্তন করে দিতে পারেন। এবং জঘন্য পাপী আল্লাহর অলী হয়ে যেতে পারে। কথিত আছে যে, এক ডাকাত ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে এক বাড়ীতে গিয়ে হানা দিল। সেখানে একটি ছোট্ট শিশু তখন কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিল।

"সে সময় কি এখনও উপস্থিত হয়নি যখন মুমিনদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনিয়াদ্র হবে।" আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এই একটি আয়াতেই তার হৃদয়ে বদ্ধ কপাট খুলে দিল। সে চিৎকার করে উঠলোঃ হাঁ প্রভু! সময় হয়েছে।

পরে এই ডাকাত সরদারই হয়েছিলেন সে যুগের অলীদের সরদার।

পার্থিব সম্মানের মোহ :

কারো কাছে আদরণীয় ও প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যও মানুষ অনেক সময় অন্যের গীবত দোষ চর্চা করে থাকে।এ কথা মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সম্মান সম্পদ সবই ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের সম্মান ও সম্পদই চিরস্থায়ী। আজ আমি ক্ষণস্থায়ী সম্মান বা সম্পদ লাভের মোহে মানুষের গীবত করছি; অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজে সম্মানিত হতে চাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখা উচিত সবার অলক্ষ্যে যিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। আর সে-ই সম্মানের পাত্র হয়ে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গীবতের কাফ্ফারা

প্রতিটি মানুষের জন্যই উচিত নিজেকে গীবতের অপবিত্রতা থেকে হিফাযত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা।

কিন্তু কখনও কোন অসতর্ক মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচনায় যদি গীবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে সাথে সাথেই তার প্রতিকারের জন্য তৎপর হতে হবে। কেননা গীবতের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে এই যে, মানুষ এটাকে খুবই হালকা ও সাধারণ মনে করে। অথচ হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

আগুন যেমন মুহূর্তে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় তদ্রূপ গীবতও বরবাদ করে দেয় মানুষের ঈমান ও আমল, ধ্বংস করে দেয় দুনিয়া ও আখেরাত।

পাপও গুনাহ দু'প্রকারের। এক প্রকার গুনাহ হচ্ছে যার সম্পর্ক শুধু আল্লাহর সাথেই। যেমনঃ নামাজ না পড়া, মদ পান করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার গুনাহ হচ্ছে যার সম্পর্ক বান্দার সাথে। অর্থাৎ যে গুনাহের মাধ্যমে অন্য মানুষের হকও নষ্ট হয়। যেমনঃ ওজনে ফাঁকি দেয়া, আমানতে খিয়ানত করা ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার গুনাহ থেকে তওবা করার নিয়ম হচ্ছে এই যে—

কৃত অপরাধের কারণে নিজেকে খুবই লজ্জিত বোধ করতে হবে।

মুখে অনুতাপ প্রকাশ করে ইসতিগফার করতে হবে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি করবে না।

মানুষ যখন অনুতাপ দগ্ধ অন্তরে আল্লাহ পাকের দরবারে মাগফেরাতের প্রত্যাশী হয়, কম্পিত হাত দুটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দুফোঁটা চোখের পানি বর্ষণ করে তখন আল্লাহ পাকের রহমতের দরিয়া অবশ্যই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। জঘন্যতম অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা করে দেন সেই মুহূর্তে। কবুল করে নেন তার তওবা।

আল্লাহ পাকের রহমত সম্পর্কে কখনও নিরাশ হতে নেই।

আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর পাক কালামে এরশাদ করেছেন :

আল্লাহর রহমত সম্পর্কে তোমরা নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই তিনি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি-ই তো একমাত্র ক্ষমাশীল, দয়াময়।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

আল্লাহর রহমত ও করুণা সম্পর্কে নিরাশা প্রকাশ করো না কেননা একমাত্র অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।

আল্লাহর মারেফাত ধন্য কবি কত সুন্দর করেই না বলেছেনঃ

☆ তুমি যেই হও, কাফির কিংবা অগ্নিপূজক এবং যত জঘন্যই হোক তোমার অপরাধ, ফিরে এসো! আমার করুণা ও রহমতের স্নিগ্ধ ছায়াতলে ফিরে এসো!! তুমি যদি হাজার বারও তোমার তওবা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাকো তবু ফিরে এসো। কেননা এ চির অবারিত দুয়ার থেকে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি।

আর যদি সে অপরাধের সম্পর্ক কোন মানুষের সাথে হয় তবে সে ক্ষেত্রে শুধু তওবাই যথেষ্ট নয় বরং যার হক নষ্ট করা হয়েছে যে কোন উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যেমন কেউ ওজনে ফাঁকি দিলো। এখানে যেহেতু আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করার সাথে সাথে মানুষের হকও নষ্ট করা হয়েছে তাই এ অপরাধ মোচনের জন্য শুধু তওবাই যথেষ্ট নয়। বরং উক্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হয়তো দয়া করে নিজের হক মাফ করে দিবেন কিন্তু বান্দার হক কিছুতেই ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না বান্দা নিজেই তার হক মাফ করে দেয়।

এ ক্ষেত্রে কোনরূপ লজ্জাবোধ করা মোটেই উচিত নয়। কেননা আখেরাতের ভয়াবহতা ও বিভীষিকার তুলনায় দুনিয়ার লজ্জা খুবই তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী।

এ হাদীসটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে কেয়ামতের দিন একজন লোক অনেক নেক আমল নিয়ে হাজির হবে কিন্তু একদল লোক তাকে ঘিরে দাঁড়াবে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হক নষ্ট করার অভিযোগ উত্থাপন করবে।

আল্লাহ পাক তখন তার সমস্ত নেক আমল অভিযোগকারীদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন। কিন্তু দেখা যাবে যে, এক সময় তার নেক আমল শেষ হয়ে গেছে অথচ অভিযোগকারীদের দীর্ঘ তালিকা তখনও বাকি।

তখন আল্লাহ পাক মানুষের সকল পাপের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিবেন। মানুষ তার নেক আমল নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। আর তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

গীবত হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ। কেননা গীবতের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করার সাথে সাথে মানুষের হকও নষ্ট করা হচ্ছে।

ও যদি গীবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তখন সাথে সাথে হাদীস শরীফে বর্ণিত গীবতের ভয়াবহ পরিণতি ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করতে হবে। লজ্জা ও অনুতাপের অশ্রু প্রবাহিত করতে হবে, মুখে ইসতিগফার করতে হবে। সেই সাথে ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, এই জঘন্য পাপ আর কোনদিন করবো না। আর কখনও মুখে তুলবো না মৃত মানুষের গলিত দুর্গন্ধময় লাশের গোশত।

কবি বড় সুন্দর বলেছেনঃ

"অপরাধ করে ফেলেছো? ভয় কি? তোমার দুটি চোখ আছে; অতএব অশ্রু প্রবাহিত করো। মুখ আছে, অতএব ইসতিগফার করো। আছে হৃদয় অতএব তাকে অনুতাপে দগ্ধ হতে দাও এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।"

অতঃপর যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে মুআমালাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। যথা—

গীবতকৃত ব্যক্তি যদি এখনও দুনিয়াতে জীবিত থাকে এবং এই গীবত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকে তবে তার কাছে গিয়ে অনুতাপ দগ্ধ আর বিনয়াবনত হয়ে বলতে হবে যে, ভাই! তুমি জানো আমার দ্বারা গীবতের হয়ে আছে। ভাই! আমি আমার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ পাক তোমাকেও ক্ষমা করে দিবেন।

যদি উক্ত ব্যক্তির এটা জানা না থাকে যে কি ধরনের গীবত করা হয়েছে তবে তাকে বিস্তারিতভাবে জানানো উচিত নয় শুধু এতটুকু বলতে হবে যে, ভাই! তুমি নিশ্চয় শুনেছো যে আমি তোমার গীবত করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

গীবতকারীকে ক্ষমা করার ফজিলত :

এ কথা ঠিক যে গীবতকৃত ব্যক্তিকে শরীয়ত এ অধিকার দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে অভিযোগ পেশ করতে পারে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কেউ যদি দুনিয়াতে মানুষের অপরাধ মাফ করে দেয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকও তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ পাক বলবেন : ক্ষমা করা হচ্ছে আমার গুণ। এটা কি করে হতে পারে যে, তুমি মানুষকে ক্ষমা করে দিবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।

হযরত জয়নুল আবেদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতি দিন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন :

হে আল্লাহ্! আজকে সারাদিন যারা আমার গীবত করবে তাদের সকলকেই আমি ক্ষমা করে দিলাম। তুমিও আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিও।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

জান্নাতে একটি প্রবেশ দ্বার শুধু ঐ ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যারা নিজ অত্যু চারীকে ক্ষমা করে দেয়।

অন্যত্র এরশাদ করেছেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক তার হিসাব সহজ করে দিবেন। এবং স্বীয় রহমত ও করুণা বলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। ছাহাবাগণ আরয করলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তিনটি গুণ কি কি?

এরশাদ হলো :

যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে তুমি দান করবে। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার প্রতি আরো নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় দিবে। এবং যে তোমার প্রতি জুলুম করেছে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিবে।

—তারগীব ওয়াত্তারহীব।

—নুহাতুল মাজালিস।

গীবত শ্রবণের পাপ :

পূর্বে ও একথা বলা হয়েছে যে, গীবত করা যেমন গর্হিত তেমনি গীবত শ্রবণ করাও গর্হিত অপরাধ।

হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়েত করেছেন : "রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গীবত করা এবং গীবত শ্রবণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

—সীরাতে আহমাদিয়া।

কখনো কারো গীবত শ্রবণের পর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই যে, যার গীবত করা হয়েছে তার প্রতি বদ ধারণা পোষণ করো না এবং উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যে-সব দোষ আলোচিত হয়েছে তা বিশ্বাস করো না। কেননা গীবত একটি মহাপাপ অতএব গীবতকারী কখনও বিশ্বস্ত হতে পারে না। এ সব তথাকথিত দোষ তুমি অন্যের কাছে আলোচনা করো না।

হযরত ঈসা আলাইহিস্সাল্লাম একবার স্বীয় অনুসারীদের বললেনঃ

কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে আর তার ছতর সামান্য একটু খুলে গিয়ে থাকে তখন তোমরা কি করবে? তার ছতর ঢেকে দিবে নাকি তাকে আরও বেআব্রু করে দিবে?

সকলে উত্তর দিলোঃ বরং আমরা তার ছতর ঢেকে দিব।

তখন হযরত ঈসা আলাইহিস্সাল্লাম বললেনঃ তবে যখন কোন মানুষের দোষ আলোচনা হয় তখন কেন তোমরা তার দোষ ঢেকে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়ে যাও।

যখন কোন মজলিসে কারো গীবত শুরু হয় তখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে উক্ত ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করে দেয়া। অন্যথায় কিয়ামতের দিন গীবত শ্রবণের অপরাধে তুমিও পাকড়াও হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল ইবনুল মোবারকের মজলিসে এক ব্যক্তি হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির গীবত শুরু করলো।

হযরত ইবনুল মোবারক তাকে থামিয়ে বললেনঃ তুমি ইমাম আবু হানিফার গীবত করছো অথচ তাঁর শান ছিলো এই যে, একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত একই অজু দিয়ে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন। হাশিয়া দুররুল মোখতার।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের আবরু রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে (গীবত হতে থাকলে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করবে) কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তারগীব ওয়াতারহীব।

তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করবে (যেমন গীবত হতে থাকলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করা এবং তার প্রশংসা শুরু করে দেয়া) তবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার সাহায্য করবেন।

সিরাতে আহমাদিয়া।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ যার সামনে কোন মুসলমান বেইজ্জতি হয়েছে অথচ সে তাকে সাহায্য করেনি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলের সামনে তাকে বেইজ্জতি করবেন।

জামেউচ্ছাগীর ছুয়ূতী

একবার রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে একজন ছাহাবী কারো সামান্য দোষচর্চা করলেন। মজলিসে উপস্থিত অপর এক ছাহাবী তাকে বাধা দিলেন। তখন রসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে কেয়ামতের দিন তার জাহান্নামের আগুনের মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি হবে।

উপসংহার:

গীবত বা পরনিন্দা একটি মারাত্মক নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি, যা ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক মানবিক মূল্যবোধকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গীবত কেবল একটি ব্যক্তিগত পাপ নয়; বরং এটি সমাজে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, হিংসা এবং বিভেদের বীজ বপন করে। ইসলাম ধর্মে গীবতকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

গবেষণার আলোচনায় দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ অজ্ঞতাবশত, অভ্যাসবশত কিংবা সামাজিক প্রভাবে গীবতে লিপ্ত হয়। তবে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ—এটি মানুষের অন্তরকে কঠোর করে, আত্মিক শান্তি নষ্ট করে এবং আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় করে তোলে। গীবতের ফলে ব্যক্তি নিজের অজান্তেই নেক আমল হারাতে থাকে, যা পরকালে কঠিন শাস্তির কারণ হতে পারে।

অতএব, গীবত থেকে বিরত থাকা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ চর্চা এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল স্তরে গীবতের কুফল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান করলে এ থেকে মুক্ত থাকা সহজতর হবে।

পরিশেষে বলা যায়, গীবত পরিহার করা একজন মানুষের চরিত্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যক্তি যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং অন্যের সম্মান রক্ষায় সচেতন থাকে, তবে একটি সুন্দর, সহানুভূতিশীল ও আল্লাহভীরু সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই গবেষণা ভবিষ্যতে গীবত প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।